বঙ্কিমচন্দ্রের বিবিধ প্রবন্ধ ও সমকালীন বাংলাসাহিত্য

অশোক কুমার রায়

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধগুলিকে আমরা মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি – প্রথমতঃ যে সব প্রবন্ধে তিনি সাহিত্যের কথা, সমাজের কথা, ধর্মের কথা এবং জীবন সমস্যার কথা বলেছেন, আর দ্বিতীয়তঃ যে সব প্রবন্ধে তিনি প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে হৃদয়ের কথা বলেছেন। 'লোকরহস্য' ও 'কমলাকান্তের দপ্তর'ই এই দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর মধ্যে বিষয়বস্তু একেবারে গৌণ, প্রত্যেকটি প্রবন্ধে অত্যন্ত তুচ্ছ বস্তু নিয়ে উর্ণনাভের মত তিনি জাল বয়ন করেছেন এবং প্রত্যেকটি প্রবন্ধের মধ্যে আপনার হৃদয়ের রস মিশিয়ে লিখেছেন। বঙ্কিমের সমগ্র সাহিত্যের মধ্যে তাঁর ব্যক্তিত্বটি জ্বলজ্বল করছে কিন্তু সেই চাপা ওষ্ঠাধরের অন্তরাল থেকে ব্যক্তিহৃদয়ের কথাগুলি লিরিকের সুরে আর কোথাও উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেনি। তাঁর অবশিষ্ট প্রবন্ধগুলির মধ্যে সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম ও জীবন সম্বন্ধে তাঁর বহু মতামত, নানা আলোচনা আছে, কিন্তু সেখানে তাঁর ব্যক্তি-হৃদয়ের স্পন্দনটি subjective ও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠেনি। বঙ্কিম যে গদ্যে উৎকৃষ্ট লিরিক রচনা করবার ক্ষমতা সত্ত্বেও তাঁর গদ্য-রচনায় তাকে বেশি প্রাধান্য দেন নি, তাঁর কারণ বঙ্কিমের কবিমানসের নিজস্ব আদর্শ ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২) এর ভাষায় – "বঙ্কিমের সাহিত্য সাধনায় প্রেরণা জোগাইয়াছিল, প্রত্যক্ষভাবে – স্বজাতি, স্বদেশ ও স্ব সমাজ এবং পরোক্ষভাবে – মানবের অদৃষ্ট ও মনুষ্যত্বের আদর্শসন্ধান। যে-জ্ঞান তত্ত্বমাত্র, যে-ধর্ম শুষ্ক তর্ক মাত্র, এবং যে-কাব্য নিছক আর্ট মাত্র, বঙ্কিম তাকে বরণ করেননি। বুঝতেন না বলে নয়, তিনি তা' চাননি, তাঁর প্রাণ

নিষেধ করেছিল। যে ধর্ম মানুষের জীবনের সর্ববিধ প্রয়াসের মধ্যে সার্থক হতে চায় – যে ধর্ম, জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম ও কর্মের সঙ্গতি রক্ষা করে পূর্ণ মনুষ্যত্ব সাধনের উপায়, বঙ্কিম তাঁকেই বরণ করেছিলেন। আবার যে দেশ, যে জাতি ও যে সমাজে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন – সেই দেশের ইতিহাস, সেই জাতির সাধনা, সেই সমাজের ধর্মকে উদ্ধার করাও তাঁর জীবনের ব্রত ছিল, নিজের মহতী প্রতিভা তিনি তদর্থে উৎসর্গ করেছিলেন। তাই আর্টের তুরীয় লোকে বিচরণ করেও বঙ্কিম স্বদেশ, স্বজাতি ও মনুষ্যত্বের আদর্শকে ভুলতে পারেননি, লিরিসিজমের স্রোতে ভেসে আত্মকেন্দ্রিক হতে পারেননি। বঙ্কিমের 'বিবিধ প্রবন্ধ', 'বিজ্ঞান রহস্য', শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা ও অনুবাদের 'ভূমিকা', 'কৃষ্ণচরিত্র' এবং 'অনুশীলন'-এর প্রতি দৃষ্টি দিলেই এ কথা বোঝা যাবে। বঙ্কিমের কবিমানসের এই নিজস্ব আদর্শ ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে আপনার উদ্দেশ্যকে এবং আপনার সাধনাকে পূর্ণরূপে সিদ্ধ করবার অবকাশ পায়নি। সেই জন্য তাঁকে প্রবন্ধ সাহিত্যের সৃষ্টি করতে হয়েছিল এবং সে রচনার পিছনে কেবলমাত্র 'বঙ্গদর্শন' বা 'প্রচার'-এর তাগিদ ছিল মনে করলে ভুল হবে, আসলে তার পিছনে ছিল অন্তরের প্রেরণা।

'বিবিধ-প্রবন্ধ' প্রথম খণ্ডের (১৮৮৭) মধ্যে বঙ্কিমের যুগের এবং আমাদের যুগেরও কয়েকটি প্রধান সমস্যাকে কেন্দ্র করে একাধিক প্রবন্ধ আছে, সেগুলিই প্রথমে আলোচ্য। 'অনুকরণ', 'বাঙ্গালীর বাহুবল', 'ভারতবর্ষ পরাধীন কেন?', 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা', 'প্রাচীনা ও নবীনা' প্রভৃতি প্রবন্ধ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের বিস্ময়ের ফলে বাঙালী সন্তানের চোখ ঝলসিয়ে গিয়েছিল। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের জয়গানে, বন্ধন-মোচনের আনন্দে, নবজাগরণের উত্তেজনায় ইউরোপের নব্য ন্যায় ও তথ্যনিষ্ঠ দর্শন-বিজ্ঞান একদিকে বাঙালীর বুদ্ধিবৃত্তিকে শাণিত করেছিল, অন্যদিকে তার হৃদয়কে অন্ধ আবেগে পশ্চিমের ভিতর-বাহির সব কিছুরই অনুকরণ করাচ্ছিল। প্রাচীন আদর্শের বটবৃক্ষকে উৎপাটিত করে তারই শূন্য গহ্বরে সদ্য আগন্তুক নব আদর্শের ওক বৃক্ষকে কাণ্ড মূল শাখা-প্রশাখা সহ সংস্থাপিত করতে চেয়েছিল। ইউরোপের সাহিত্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ও মানবতার জয়গান, তার মানবমুখী দর্শন, মানব স্বাচ্ছন্দ্যের অভিমুখী বিজ্ঞান ও জীবন ব্যাপারে যুক্তিবাদের প্রাধান্য বাঙালী জীবনের জড়তা মোচনের পক্ষে প্রয়োজনীয় ছিল। কিন্তু তার সমগ্র ধারাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে ও সতর্কতার সঙ্গে বিচার করে পরিমার্জন ও পরিশোধন করে স্বীকরণের দ্বারা আত্মসাৎ করে জাতীয় জীবনের প্রবহমান ধারার সঙ্গে মিলিয়ে দেবার মত শক্তি, প্রতিভা ও বিচারবুদ্ধি উত্তেজনার মুহূর্তে সকলের ছিল না। বঙ্কিম জাতির সেই সঙ্কটের মুহূর্তে সমগ্র যুগের চিন্তাধারাকে আত্মসাৎ করে তাকে যুগোপযোগী নবীন আদর্শ দিয়ে কল্যাণের মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন। বঙ্কিমের সাহিত্য শিল্পে ও জীবন দর্শনে পাশ্চাত্য প্রভাব ভাস্বর হয়ে রয়েছে, কিন্তু পাশ্চাত্যের চিন্তাধারা মানবধর্মের যে টুকু অংশকে পরিপূর্ণ মানবত্বের আলোকে সত্য বলে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন তাঁর দেশের ও জাতির জীবনে তিনি সাহিত্য-পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে সেটুকুকেই দিতে

চেয়েছিলেন। বাঙ্গালীর পক্ষে ইংরেজের অনুকরণের প্রয়োজনীয়তা এবং সেই অনুকরণে সতর্কতা সম্বন্ধে 'অনুকরণ' প্রবন্ধে বঙ্কিমের সাবধান বাণী এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। 'বাঙ্গালীর বাহুবল', 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা' ও 'ভারতবর্ষ পরাধীন কেন' এই তিনটি প্রবন্ধে বর্ত্তমানের দুর্গতির আলোচনা প্রসঙ্গে অতীত ইতিহাসের কারণ এবং ভবিষ্যতের পথ নির্দেশের যে বিশ্লেষণ বঙ্কিম করেছেন সেরকম যুক্তি সম্বন্ধ প্রবন্ধ বঙ্কিম পূর্ববর্তী সাহিত্যে একান্ত দুর্লভ, একমাত্র মনীষী অক্ষয় কুমার দত্তের (১৮২০-১৮৮৬) রচনায় তার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। বর্তমানের অবস্থা বোঝাবার জন্যে যে অতীতের ইতিহাস জ্ঞান একান্ত প্রয়োজন একথা বঙ্কিম বুঝেছিলেন, তাই তিনি বার বার এই আত্মবিস্মৃত জাতিকে তার অতীতের ইতিহাস, যেখানে তার সাধনা ও গৌরব এবং যেখানে তার পতনের কারণ লুক্কায়িত আছে তার অনুসন্ধান করতে আহ্বান করেছিলেন। 'জয়দেব ও বিদ্যাপতি'-র আলোচনার শুরুতে ভারতীয় সাহিত্যের গতির মধ্যে যে ভারতীয় ইতিহাস রয়েছে তার একটি দীর্ঘ আলোচনা তিনি করেছেন এবং কাব্যের অন্তরালস্থিত জাতীয় ইতিহাসের সূত্রটি দেখিয়ে দিয়েছেন। 'বাঙ্গালীর বাহুবল'-এর মধ্যেও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাই। কিন্তু 'বিবিধ প্রবন্ধ' প্রথম খণ্ডতে বাঙ্গালার অতীত ইতিহাসের বিস্তৃত আলোচনা হয়নি। বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় খণ্ডে (১৮৯২) বঙ্কিম ও সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন এবং বঙ্কিমের আগে বাংলার বিস্তৃত ইতিহাস আর কেউ রচনা করেননি। 'বাঙ্গালীর ইতিহাস', 'বাঙ্গালীর কলঙ্ক', 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা', 'বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ' প্রবন্ধগুলিই তাঁর সাক্ষ্য। সেই আত্মবিস্মৃতির যুগে জাতীয় চেতনার উদ্বোধনের জন্য বঙ্কিম উপন্যাসে, গানে, প্রবন্ধে, গদ্য-লিরিকে (একটি গীত) সাহিত্যের সকল শাখায় শঙ্খ নিনাদ করেছেন এবং কেবল উপন্যাসের অর্ধ-কাল্পনিক কাহিনী বা লিরিকের উচ্ছ্বসিত আবেগ দ্বারা নয়, ইতিহাসের দৃঢ় ভিত্তিভূমি থেকে প্রমাণের মধ্যে দিয়ে বাঙালীকে মা 'যা' ছিলেন, তার মূর্তি এবং মা 'যা' হবেন তারই স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছেন। সাহিত্যিকদের সঙ্গে ঐতিহাসিকের কাজ যে তাঁকে করতে হয়েছিল তাঁর কারণ বাঙালীকে সূক্ষ্ম রসবোধের সঙ্গে উন্নত মনুষ্যত্ববোধের সমন্বয়ের পথ দেখান তাঁর সাহিত্যিক প্রেরণার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আদর্শ ছিল। সেইজন্যই যে যুগে মধুসূদন ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি কেবল শিক্ষিতদের জন্য এবং তার মত চিন্তাধারা বিশিষ্টগণের জন্য সাহিত্য রচনা করবেন ("Write only for those who think as I think and who are imbued with Western thoughts and Western ideas"), সেই যুগে বঙ্কিম 'সাম্য', 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রভৃতি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করে বর্তমান কৃষক-দরদীদের পথ প্রদর্শক হয়ে আছেন। বঙ্কিমের স্বজাতি প্রীতির অপর দুটি উদাহরণ 'বাঙালীর উৎপত্তি' এবং 'বাঙলা ভাষা' প্রবন্ধদ্বয়। অক্ষয় কুমার দত্ত ছাড়া বঙ্কিমের পূর্ববর্তী কোন সাহিত্যিক সাহিত্য রচনা করবার সঙ্গে বাংলা ভাষাতত্ত্বের অনুসন্ধান করেননি। ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানে বঙ্কিমের নিষ্ঠা ও সত্যানুরাগ যেমন বিস্ময়কর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞানও তেমনি গভীর। 'বাঙালীর উৎপত্তি' প্রবন্ধে বাংলার অনার্য অধিবাসীগণের সম্বন্ধে তিনি যা' লিখেছিলেন তা'তে নৃ-তত্ত্ব আলোচনার প্রতি

যে তাঁর বৈজ্ঞানিক মন আকৃষ্ট হয়েছিল তা' বোঝা যায়।

বিবিধ প্রবন্ধ প্রথম খণ্ডে আর এক শ্রেণীর প্রবন্ধে বঙ্কিম প্রাচীন ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। 'আর্যজাতির সূক্ষ্ম শিল্প,' 'প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি', 'জ্ঞান ও সাংখ্যদর্শন' প্রবন্ধগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। বঙ্কিমের আগে আর একজন মাত্র সাহিত্যিক রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রকে সংস্কৃতের গিরি শিখর থেকে বাঙলার সমতলভূমিতে সর্বজন বোধগম্য করে দেবার চেষ্টা করেছিলেন।

এছাড়াও বিবিধ প্রবন্ধ প্রথম খণ্ডে আরও এক শ্রেণীর প্রবন্ধ সেগুলি সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ এবং আলোচ্য গ্রন্থের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ। 'উত্তর চরিত', 'শকুন্তলা-মিরান্দা-দেসদিমোনা', 'দ্রৌপদী', 'জয়দেব ও বিদ্যাপতি', সাহিত্য সমালোচনা এবং গীতিকাব্য ও প্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃত সাহিত্যরূপের (form) ও সাহিত্যবস্তুর আলোচনা। প্রথম চারটি প্রবন্ধের মধ্যে বঙ্কিমের সূক্ষ্ম রসবোধ, রসাস্বাদনে বিচারবোধ (discriminating faculty) এবং সংস্কৃত, ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যের গভীর জ্ঞান এবং সর্বোপরি উৎকৃষ্ট সমালোচন-ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। অন্য দুটি প্রবন্ধের মধ্যে যে সাহিত্যরূপের ও সাহিত্যবস্তুর আলোচনা পাওয়া যায় বঙ্কিমের আগে বোধহয় বাংলা সাহিত্যে সেরকম আলোচনা কেউ করেননি। বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধ রচনা ও সত্যকার সাহিত্য সমালোচনা বঙ্কিমচন্দ্রই প্রবর্তন করেন এবং পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) লেখনীতে বঙ্কিম প্রবর্তিত এই নতুন ধারা চরমোৎকর্ষ লাভ করে। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের রচনাসাদৃশ্যটুকু লক্ষণীয়। বঙ্কিম সংস্কৃত কাব্যের যে সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করেছেন, রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্যে'র মধ্যে তার আংশিক প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্যে' 'কুমারসম্ভব' ও 'শকুন্তলা' প্রবন্ধে পঞ্চতপা পার্বতীর সঙ্গে শকুন্তলার তুলনা এবং শকুন্তলা প্রবন্ধে শকুন্তলা নাটকের সঙ্গে টেম্পেষ্ট নাটকের তুলনা বঙ্কিমের 'শকুন্তলা-মিরান্দা-দেসদিমোনা' ও 'দ্রৌপদী' প্রবন্ধ স্মরণ করিয়ে দেবেই। রবীন্দ্রনাথ 'আধুনিক সাহিত্যে' 'বিদ্যাপতির রাধিকা' প্রবন্ধে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির যে তুলনা করেছেন তার সঙ্গে বঙ্কিমের 'জয়দেব ও বিদ্যাপতি'র মূল বক্তব্যের গভীর সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে বাঙলার একজন মাত্র উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯) তাঁর পূর্ববর্তী যুগের ভারতচন্দ্র রায় (১৭১২-১৭৬০), রামপ্রসাদ সেন (১৭২০-১৭৮১), নিধুবাবু (রামনিধি গুপ্ত) (১৭৪১-১৮৩৯), রাম বসু (১৭৮৬-১৮২৮), হরু ঠাকুর (১৭৩৮-১৮৩), লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস (১৭৪৫-১৮২১), রাসু রায় (১৭৩৫-১৮০০) এর জীবন ও রচনা সম্পর্কে কয়েকটি সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। বঙ্কিম বাংলার সমসাময়িক সাহিত্যিকগণের সম্বন্ধে 'ঈশ্বরগুপ্তের কবিত্ব' 'দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী' 'বাঙ্গলা সাহিত্যে প্যারীচাদ মিত্রের স্থান' এবং সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী শীর্ষক কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন, সে যুগের সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে এইরকম প্রবন্ধ কেউ লিখতেন না, পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কালের লেখকদের – বঙ্কিমচন্দ্র, বিহারীলাল ও সঞ্জীবচন্দ্র সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনা করেন। বঙ্কিম 'বঙ্গদর্শনে' পুস্তক সমালোচনায় পাইকারী পন্থা অবলম্বন করেন নি। মাসিক

পত্রের স্তম্ভে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ সমালোচনা প্রবর্তন করেন। বিবিধ প্রবন্ধ প্রথম খণ্ডের দুটি প্রবন্ধে 'আর্যজাতির সূক্ষ্ম শিল্প' ও 'অনুকরণ', শ্যামা চরণ শ্রীমাণির ও রাজনারায়ণ বসুর পুস্তকদ্বয়ের সমালোচনা প্রসঙ্গে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথও তাঁর সাধনা পত্রিকায় এই পন্থা অবলম্বন করেন। 'ফুলজানি' ও 'যুগান্তর' উপন্যাসের সমালোচনা এবং 'আর্যগাথা', 'আষাঢ়ে' ও 'মন্দ্র' প্রভৃতি কবিতা গ্রন্থের আলোচনা দ্রষ্টব্য। বঙ্কিম 'বাঙলার অতীত ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে হিন্দুরাজগণের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন, পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথও 'মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস' সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনা করেন। বস্তুতঃ বঙ্কিমচন্দ্র বাংলায় যে উচ্চশ্রেণীর সমালোচন সাহিত্যের প্রবর্তন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাকে পরমোৎকর্ষ দান করেছেন। সাহিত্যের এই ধারাটিতে বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোন উল্লেখযোগ্য তৃতীয় লেখক আবির্ভূত হন নি। কিন্তু এখানে বঙ্কিমের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা বঙ্কিম অনেক সংযতবাক্ প্রাবন্ধিক, প্রকাশভঙ্গীর গাঢ়তায় বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করতে পেরেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে আধুনিক কালে একটি কথা উঠেছে যে তিনি সাহিত্য স্রষ্টা অপেক্ষা প্রচারকই ছিলেন বেশি এবং এই মানদণ্ডে বঙ্কিমের প্রবন্ধ সাহিত্যকে মূলতঃ প্রচারমূলক রচনা বলেই বোধ হয় ধরা হবে। এর উত্তরে শুধু এইটুকুই বলতে চাই যে সাহিত্যের মধ্যে প্রচার কার্যের স্থান আছে কিন্তু সেই প্রচারকার্যকে সাহিত্য হয়ে উঠতে হবে। যেখানে লেখকের রচনার মধ্যে কেবলমাত্র কতকগুলি গুরুগম্ভীর তত্ত্ব বা তথ্যের সমাবেশ করা হয় মাত্র, তার অন্তরাল থেকে সাহিত্যিকের ব্যক্তিমানসের দৃষ্টিভঙ্গীটি, সাহিত্যিকের জীবন সমালোচনা (Criticism of Life) প্রকাশিত হয় না অর্থাৎ তা কোনদিনই সাহিত্য পদবাচ্য হয় না। কবিমানসের দৃষ্টিভঙ্গী ও আদর্শ তাঁর সাহিত্যের উপর ছায়া ফেলবেই, তাঁর আদর্শকে তিনি সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে প্রচার করতে পারেন কিন্তু তা সাধারণ প্রচার কার্যের মত আমাদের রসবোধকে ক্ষুণ্ণ না করে তাঁর রচনার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করলে আমরা তাকে সাহিত্য বলে স্বীকার করে নেবো। বঙ্কিম যে আদর্শকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করেছিলেন এবং যে আদর্শের অনুপ্রেরণায় তিনি একটি জাতির মধ্যে সূক্ষ রসবোধের সঙ্গে কঠিন মেরুদণ্ডের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন সে আদর্শ ও সাধনা নিয়ে আজকের সাহিত্যিকগণ সাহিত্য রচনা না করতে পারেন, কিন্তু এই আদর্শের বিভিন্নতার জন্য এই মানসিক দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের জন্য বঙ্কিমের রচনাকে কেবলমাত্র প্রচারকার্য বলে দূরে সরিয়ে রাখা যায় না, প্রচার কার্যকে ছাড়িয়ে তাদের মধ্যে যে সূক্ষ্ম রসজ্ঞতা ও জীবন সমালোচনা দেদীপ্যমান হয়ে রয়েছে তার মূল্য কিছুতেই কমানো যায় না। এই দিক থেকে বিচার করলে বিবিধ প্রবন্ধের অধিকাংশ প্রবন্ধই সাহিত্য এবং বাংলা সাহিত্যে অভিনব সৃষ্টি।

সাহিত্যসম্রাটের সমগ্র ভাবনায় কবিপ্রাণতা

অধীরকৃষ্ণ মণ্ডল

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা কথা সাহিত্যের জনক। প্রত্যেক কবি, সাহিত্যিক ও নাট্যকার ব্যক্তিগত জীবনে যে প্রতিষ্ঠা পাক না কেন, তার প্রথম হাতে খড়ি ছড়া বা কবিতা দিয়ে। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য সূচনা কবিতা দিয়েই। কেউ কেউ কাব্যমঞ্চে থেকে যান, আবার অনেকের কাব্যের পাপড়ি খুলে পদ্মের কোরকের মতো বহিঃপ্রকাশ ঘটে কথাসাহিত্যের অপার মহিমায়। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য জীবনের পাপড়ি 'ললিতা' এবং 'মানস' কাব্যগ্রন্থ। তিনি অন্তরের আবেগকে বাহন করে অনন্ত কথাশিল্পের জনক হয়ে উঠলেন। পরবর্তী স্তরে মাইলস্টোন হয়ে ওঠে তাঁর রচিত কথাশিল্প। তাঁর ছত্রছায়ায় দশকে দশকে কথাসাহিত্যের ধারা বহুমুখী হয়ে উঠেছে নানা বর্ণে, নানা উচ্চারণে।

কবি বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন আত্মসমালোচক। তিনি নিজেই তৃপ্ত নন তাঁর কবিসত্তা সম্পর্কে। কবি কিশোরের অন্তরের আবেগ ধ্বনিত হয়েছে তাঁর কাব্যমহিমা জুড়ে। আবেগপ্রবণতা কারুর চিরস্থায়ী হয় না। পরবর্তী স্তরে সেই কাব্যসত্তার বিকাশ ঘটে বাস্তবের নানা বিকিরণে। কবি বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরসত্তা সমগ্র সাহিত্যে জাগ্রত।

কবি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম আখ্যানকাব্য 'ললিতা'। পরবর্তী কাব্য 'মানস'। কাব্য দুটি বাল্যকালের রচনা। তাঁর সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছে তাঁর উপন্যাস ও প্রবন্ধের সঙ্গে বহু কবিতা। এছাড়া সমকালীন ভ্রমর এবং প্রচার ও ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর'-এ প্রকাশিত হয়েছে তাঁর পরবর্তী সময়ের কবিতা। তিনি তাঁর কবিতা প্রকাশ সম্পর্কে

বলেছেন – 'আমি নিজে প্রভাকরের নিকট বিশেষ ঋণী। আমার প্রথম রচনাগুলি প্রভাকরে প্রকাশিত হয়। সে সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আমাকে বিশেষ উৎসাহ দান করেন।' তাঁর প্রথম জীবনের কবিতা ছিল আদি রসাত্মক। নারী ও পুরুষের কথোপকথনের ভিত্তিতে লেখা কবিতা – 'হেমন্ত বর্ণনা ছলে স্ত্রীর সহিত পতির কথোপকথন' এবং 'বর্ষা বর্ণনা ছলে দম্পতির রসালাপ।'

'বর্ষা বর্ণনা ছলে দম্পতির রসালাপ' কবিতায় পতির উক্তিতে প্রকাশ পেছেয়ে নারীদেহের রূপ বর্ণনা নানা উপমাপ্রয়োগের মাধ্যমে। গ্রীষ্মের তাপ দগ্ধ পৃথিবীর সব মলিনতা মুছে বর্ষা উপহার দেয় স্নিগ্ধ মনোরম পরিবেশ, যা কবি বঙ্কিমকে মুগ্ধ করেছে। তাই আলোচ্য কবিতায় তিনি অপরূপ নারীমূর্তিকে বর্ষার রূপয়তার মধ্যে খুঁজেছেন যথার্থ রূপমাধুর্য। বর্ষায় সর্বত্র উন্মত্ততার চেয়ে আরো দ্বিগুণ উন্মত্ত হয়ে ওঠে নারীর দেহ বহু উপমা বৈচিত্রে। চুলে সিঁদূরের প্রলেপ মেঘে ঢাকা রবিরশ্মিতে প্রকাশ পায় এক অভূতপূর্ব লাবণ্যরূপে –

আরো দেখ করিবারে, বরষায় মত্ত করে,
দ্বিগুণ উন্মত্ত তুমি কর।
হেরিয়া তোমার করে, হেরি তব পয়োধরে
চিৎকার করিছে কুঞ্জর।।
যে দাড়িম্ব বরষার, সকল গর্বের সার
তব কুচে পূর্ণ মন নাশ।
মেঘে রবি ঢাকি ঢাকি, কেশেতে সিন্দুর মাখি,
তাহা হতে লাবণ্য প্রকাশ।।

'তোমাতে লো ষড়ঋতু' কবিতায় কামিনীর প্রতি পতির অসাধারণ উক্তি বড়ই রসগ্রাহী হয়ে উঠেছে। ষট্ ঋতুর মধ্যে বর্ষাঋতু মঙ্গলের, শান্তির ও পবিত্রতার প্রতীক। এই ঋতুর অবয়বে চিত্রিত হয়েছে কামিনীর দৈহিক বর্ণনার প্রতিরূপ। কবি যেমন দেখছেন বর্ষার রূপের নানা বৈচিত্র, সেরূপ তাঁর অন্তর্দৃষ্টিতে প্রতিফলিত হয়েছে কামিনীর রমনীয় বর্ষণরূপ। তাই কবি প্রকৃতির বর্ষাকালীন চিরন্তন দৃশ্যের মধ্যে খুঁজে পান তাঁর 'কামিনী'র পরিপূর্ণ অবয়ব চিত্র। তাই কবি বলেছেন –

'বরষায় মনোহর, তবু শোভাকর।
দাড়িম্ব দেখি লো ধনি, তব পয়োধর।।
গিরি পরি নব লতা, শোভে এ সময়।
সে গিরি তোমরা কুচ, হার লতা হয়।।
এস সবেতে পরাভব, বরষা পলায়।
আইল স্বদল সহ, শরদ তথায়।।'

কবি বঙ্কিমচন্দ্র রচিত 'হেমন্ত বর্ণনা ছলে স্ত্রীর সহিত পতির কথোপকথন' কবিতায় আছে দম্পতির প্রশ্নোত্তরের মধ্যে এক অভিনব বাক্‌রীতি। বিষধর সাপ বিবরে প্রবেশ করার কারণ

জানতে চেয়ে স্ত্রী বলেছে – 'কেন ফণিবর প্রবেশি বিবর,
পাতালে গমন করে।'

প্রত্যুত্তরে পতি নির্দ্বিধায় বলেছেন – স্ত্রীর বেণী দেখে সাপ গর্তে পালিয়ে গেছে। তবে সাপ বিবরে চলে গেলেও পৃথিবী হলাহল মুক্ত থাকবে না। তাই পতির উক্তি –

বেণী লো তোমারি, দেখিতে না পারি,
পলাইল বিষধরে।।
যদি বল ধনি, দূর হলে ফণি,
অবনী মণ্ডল হতে।
আর ধরাতল, কিছু হলাহল,
রহিবে না কোনো মতে।।
তা নয় তা নয়, বহু বিষ রয়,
তোমার নয়নে প্রাণ।
সে গরল পারে, সংহার সংসারে,
করিবারে সমাধান।

নারী রূপের বর্ণনায় এক বিশিষ্ট রীতির ব্যবহারে তাঁর সংযম বোধের পরিচয় মেলে।

তাঁর 'ললিতা' একটি ছোট আখ্যানকাব্য। এই কাব্যে আদিরস, ভাষা ও উপমা অনাবশ্যক প্রয়োগ নেই। কাব্যটি 'ললিতা-মন্মথ'-র প্রেম কাহিনী অবলম্বনে রচিত। এই কাব্যের কাহিনী নির্মাণে উপন্যাসের পূর্বাভাস পরিলক্ষিত।

ললিতা 'ফুলহীন বনে যেন স্থলকমলিনী'। সে রাজনন্দিনী। ছোট থেকেই সে মাতৃহীনা। পিতা ও বিমাতার নিষ্ঠুর আচরণে সে দিশাহারা। শেষে নবযুবক মন্মথ-র প্রেমে পড়েছে সে। ঘটনাক্রমে তারা দস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হলে তারা প্রবেশ করে এক গভীর অরণ্যে। সেখানে তাদের হৃদয় আপ্লুত হয় এক অপূর্ব সঙ্গীত লহরীর ধ্বনি শুনে। কিন্তু দুর্ভাগ্য – এক প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রবল ঝড়ের প্রকোপে তাদের জীবনাবসান ঘটে আকস্মিকভাবে। তাদের মৃত্যুর বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি বলেছেন – 'নাথভুজে কথা দিয়ে পড়েছে মোহিনী। / মুখে মুখে কাঁদে যেন দুটি সরোজিনী।।' একাব্যে প্রবাহিত হয়েছে রোমান্টিক প্রেমের ফল্গু ধারা। কবিমনের সাবলীল প্রকাশের মধ্য দিয়ে। তাঁর 'ললিতা' কাব্যে প্রথম সর্গের দ্বিতীয় স্তবকে প্রকাশ পেয়েছে কবির তরুণমনের যৌবনের উন্মাদনা, ক্ষণিক বিদ্যুতের মতো ক্ষণস্থায়ী – 'যৌবন আশার সম ফুল্ল রূপ তার। / দেখিয়া ফিরালে আঁখি, দেখি ফিরে বার।।' যখন বেঁচে থাকার মধ্যে তাদের জীবনে কোনো মিলনের সম্ভাবনা নেই তখন মৃত্যুর পর দেহ জলে স্থলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। এই দেহাতীত প্রেমের অপূর্ব বর্ণনা রূপ পেয়েছে 'ললিতা' কাব্যের প্রথম সর্গের চতুর্থ স্তবকে – 'মরি যদি পারিতাম, / গোলে জল হইতাম, / এ স্থির সলিলে মিশে, হৃদয় ঘুমাইত।' কবি আরো বলেছেন যার হৃদয়ে প্রেম মরে গেছে তার কাছে ধনসম্পদের সুখের কোনো মূল্য নেই এবং বাস্তবের মণিসম্পদের চেয়ে হৃদয়ের প্রেমরতন সর্বাধিক আলোকিত করে জগতে। তাই

আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় সর্গের প্রথম স্তবকে প্রকাশ পেয়েছে – 'মরি প্রেম যার মন্ড / সেকি চায় রাজ্যধন ... হৃদে তার যে রতন, / আলো করে ত্রিভুবন, / অন্য মণি নিবায় বিভায়।।' জীবনে দুঃখ-কষ্ট-জ্বালা-বিচ্ছেদ-বিবাদ যাই ঘটুক না কেন আঁখির মিলনে প্রেমের বড় প্রাপ্তি। তাই আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় সর্গের প্রথম স্তবকে উল্লেখিত হয়েছে – 'জ্বালা সয় নিরবধি, / সেও ভাল পায় যদি, / একবার আঁখির মিলন।' একই বৃন্তে দুটি ফুল ছিঁড়ে পড়ে যাওয়ার মধ্যে যে সুখ, সেরূপ 'ললিতা-মন্মথ'-র একসঙ্গে মৃত্যুতে এক অভূতপূর্ব সুখ তারা অর্জন করল। তাই আলোচ্য কাব্যের অন্তর্গত দ্বিতীয় সর্গের বারো স্তবকটি উল্লেখযোগ্য – 'এক বৃন্তে দুটি ফুল মুখে মুখ দিয়ে। / সে হৃদি কুসুমাসনে পড়েছে ছিঁড়িয়া।। / তেমনি একাঙ্গে এরা থেকে চিরকাল। / মরিল অধরাধরে কি সুখ কপাল।।'

তাঁর 'মানস' কাব্যে গভীর প্রকৃতিপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর এই কাব্যপ্রকাশে ভাব ও শব্দচয়নে প্রাচীন কাব্য ধারায় অনুসরণ ঘটেছে এক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-বর্ণনার মধ্য দিয়ে – 'দেখিব দ্বীপের শোভা মোহিত নয়নে। / বিপিন বারিধ নীল বিশাল গগনে।।' কবি জীবনে কাউকে ভালবাসতে পারেন নি, এবং কেউ তাঁকে ভালোবাসেনি। তিনি চারদিকে 'অপ্রেমী মুখ' দেখে আর স্থির থাকতে পারেন নি। তাই তিনি তাঁর প্রেম নিবেদন করেছেন প্রকৃতির কাছে। তিনি জানিয়েছেন – 'বিজন বিপিনময় দ্বীপে একা থাকি। / ভাবিয়া মনের দুঃখ ভ্রমিব একাকী।। / দেখিব দ্বীপের শোভা মোহিত নয়নে। / বিপিন বারিধি নীল বিশাল গগনে।।' তিনি শুনতে পান জলনিধিরব, দেখতে পান আকাশের বিশাল বক্ষ। স্নিগ্ধ সমীরে তাঁর হৃদয় শিহরিত হয়ে উঠবে। তিনি দেখতে পান লতা স্থলের নাচ। এইভাবে নানা প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে মোহিত হন, এবং গভীর প্রেমের সুখানুভব করেন। কিন্তু যখন রবির কিরণ আঁধারের কালো জলে ঢাকা পড়ে যায় তখন বিরহের দুঃখে কাতর হয়ে বলেছেন – 'সেই দুঃখস্বরে হৃদি, শিহরি চঞ্চল, / কাঁদিবে; না 'জানি কেন আঁখিময় জল!' আবার যখন নবীন কুসুমের হাসি দেখে মুগ্ধ হয়েছেন, কিন্তু আবার যখন ফুল ঝরে পড়ার দৃশ্য দেখেন তখন বেদনায় কাতর হয়ে কবি বলেছেন – 'তাহা গেলে হবে কুঞ্জে বিজন আঁধার। / একাকী কাঁদিব দেখে ঝরা ফুলহার।।' আবার যখন গিরিগুহায় এক ভয়াবহ প্রাকৃতিক ঝড়ের আবর্ভাব হয়, তখন যেন পর্বতে পর্বতে যুদ্ধ চলছে, ভয়ঙ্কর ভূতগণ যেন নাচছে। এই বীভৎস দৃশ্যের পর যখন শান্ত হয়ে ওঠে প্রকৃতি, তখন কবি এক অসাধারণ উপমা ব্যবহার করেছেন – 'কাঁদিয়া ঘুমালো যেন নবীন কুমার।' অবশেষে কবি প্রকৃতির অনন্ত মহিমা অনুভব করতে করতে একদিন তো এই জগৎসংসার ছেড়ে চলে যাবেন, তখন কবি বলেছেন তাঁর জন্য – 'জানিবে না শুনিবে না কাঁদিবে না কেহ।' কিন্তু কবির বিশ্বাস একমাত্র তাঁর জন্য এই পৃথিবীর – 'অনিবার জলরব কাঁদিবে কেবল। অনেকেই তাঁর 'মানস' কাব্য পড়ে ভাবেন, কাব্যটিতে শুধু প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু গভীরভাবে অনুভব করলে জানা যাবে তাঁর এই প্রকৃতিপ্রেমের মধ্যে তাঁর জীবনের সুখ-দুঃখ জড়িয়ে আছে। তিনি প্রকৃতির সৌন্দর্যানুভূতিকে যেমন সুখানুভব করেছেন, তেমন প্রাকৃতিক নানা ছন্দপতনের মধ্যে নিজেই দুঃখানলে অশ্রু বর্ষণও করেছেন। তাঁর সুখদুঃখের সাথী এই

প্রকৃতিই। এভাবে তাঁর জীবনের একাকীত্ব নিবেদন করেছেন প্রকৃতি প্রেমে।

১৮৯১ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর 'গদ্য পদ্য বা কবিতা পুস্তক' গ্রন্থটি। গ্রন্থটির কবিতা তাঁর পরিণত বয়সের লেখা। এই পর্বের কবিতা ইতিহাসের কাহিনী, প্রেম সৌন্দর্য, দেশাত্মবোধ বা কত ব্যঙ্গ ও বিদ্রুপ ইত্যাদি নানা বৈচিত্রমুখী। তাঁর 'সংযুক্তা' কবিতায় টডের রাজস্থান অবলম্বনে পৃথ্বীরাজ মহিষী সংযুক্তার চরিত্রের মহিমা ও বীরত্ব বর্ণিত। পৃথ্বীরাজ এক রাতে স্বপ্নে দেখেছেন তাঁর স্বর্গীয়া জননীকে এক বন্য হস্তী তার শূণ্ড দিয়ে মেরে ফেলেছে। বাস্তবে তুরস্কের দল তাঁর স্বদেশ আক্রমণ করেছে। তারই প্রতিফলন স্বপ্নে ইঙ্গিত বহন করেছে। বাধ্য হয়ে পৃথ্বীরাজকে রণসজ্জায় সাজাবার জন্য মহিষী বলেছেন – 'রণসাজে আমি সাজাব আজ।' মহিষী পৃথ্বীরাজকে দীপ্তকণ্ঠে বলেছেন যুদ্ধের প্রস্তুতির সময় – 'যদি হয় রণে / পাঠানের জয় / না আসিও ফিরে, – / দেহ যেন রয় / রণক্ষেত্রে ভাসি শত্রু রুধিরে।' সংসার জীর্ণ ও ব্যাধি জীবনের সুখ দুঃখ জলাঞ্জলি দিয়ে মহিষীর বলিষ্ঠ কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে – 'নয় গেল প্রাণ, / ধর্ম্মের কারণে? / চিরদিন রহে জীবন কার?' যথারীতি পৃথ্বীরাজ পাঠানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাত্রা করেছেন এবং অবশেষে সম্মুখ সমরে নিহত হন। মহিষীর মহিমাও অপার। তাই তিনি বলে উঠলেন – 'আমিও যাইব / সেই স্বর্গপুরে, / বৈকুণ্ঠেতে গিয়া / পূজিব প্রভুরে, ... সাজা মোর চিতা সজনীবর্গে।।' কবির অসাধারণ বর্ণনায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে – 'সেই চিতানল, / দেখিল সকলে / আর না নিবিল / ভারতমণ্ডলে / দহিল ভারত / তেমনি অনলে / শতাব্দী শতাব্দী শতাব্দী পরে।।' কবির 'আকাঙ্ক্ষা' কবিতাটি প্রেমের কবিতা। সুন্দরী ও সুন্দরের একে অপরের কাছে প্রেমের আকাঙ্ক্ষা নিবেদিত। প্রথমে সুন্দরীর প্রেমের আকুতি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে – 'কেন না হইলি তুই, যমুনাতরঙ্গ / জোর শ্যাম ধন! / দিবারাতি জলে পশি, / থাকিতাম কালো শশি, / করিবারে নিত্য তোর নৃত্য দরশ।। / ওহে শ্যাম ধন!' আবার অন্যদিকে সুন্দরের প্রেমের অন্তর্বার্তা নিবেদিত – 'কেন না হইনু আমি, কপালের দোষে, / যমুনার জল। / লইয়া কম কলসী, / সে জল মাঝারে পশি, / হাসিয়া ফুটিত আসি, রাধিকা-কমল– / যৌবনেতে ঢল ঢল।।'

তাঁর রচিত 'সাবিত্রী' উনিশ স্তবকের একটি দীর্ঘ কবিতা। এই কবিতায় সতীসাধ্বী সাবিত্রী তাঁর মৃত স্বামীর সঙ্গে স্বর্গে যাওয়ার বিবরণ বর্ণিত। গভীর অধিকার দুর্গম বনের মধ্যে সাবিত্রী একাকিনী তাঁর মৃত স্বামীকে কোলে করে বসার বর্ণনা উল্লেখিত – 'মহাগদা তবে চমকে তিমিরে, / শব–পদরেণু তুমি লয়ে শিরে, / ত্যজে প্রাণ সতী অতি ধীরে ধীরে / পতি কোলে করি।।'

'আদর' কবিতাটিও মূলতঃ অনুপম প্রেমের কবিতা। কবি মরুভূমিময় জীবনে নিদাঘ সন্তাপময় জীবনে, চির অভাব কষ্টময় জীবনে, চিরবিরহী জীবনে খুঁজে ফেরেন কুসুমের সুবাস, বিশাল সরসী প্রান্তর, রত্নশোভিত অনন্ত সাগর, মিলনের অনুকূল পরিবেশ তাঁর প্রিয় সংসার জীবনে। তিনি তাঁর দুঃখ বিনানেশর মধ্যে খুঁজে পান 'কৌমুদীমুখের হাসি'।

তাঁর 'বায়ু' কবিতাটি একটি রোমান্টিক কবিতা। বায়ুর বর্ণময় জীবনের ভূমিকা অনন্য।

বায়ুর জীবনীপাঠে কবিমনে জেগে ওঠে স্বাধীন রোমান্টিক ভাবনা। সে বসন্তের নবীন ফুলের গন্ধ চুরি করে নিজের শরীরে লেপন করে বেড়ায়। সরোবরে স্নান সেরে বাতায়নে উপবিষ্ট সুন্দরীদের পাশে গ্রীষ্মের জ্বালা জুড়ায়, তাদের অলকা ধরে সুখ-চুম্বন করে তাদের ঘর্ম হরণ করে। সে যুবতীদের মন ভোলায়। কখনো বেণুবনে মোহন বাঁশীর সুরের লহরী তোলে। তাই কবি উচ্চারণ করেছেন – বায়ু যেন 'মজাইনু বাঁশী হয়ে, গোপের গোপিনী।' এককথায় বায়ু সংসারের প্রাণকর্তা, আবার সে যেন – 'শিহরে পরশে মন কূলের কামিনী।'

'আকবর শাহের খোষরোজ' কবিতায় বর্ণিত হয়েছে আর্যকন্যার শক্তি ও গৌরব। যেখানে একদিকে রাজার দুলালী, ওমরাহজায়া ও আমীরজাদী রমনীরূপের হাটে বেচা-কেনা ব্যাপারে ব্যস্ত, অন্যদিকে একচন্দ্রাননী বলেছে– 'কুলনারীগণে, / বিকাইতে লাজ / বসিয়াছে ফেঁদে রসের হাট!' তাই সে ভারতভূপতি আকবরকে উদ্দেশ্য করে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানিয়েছে – 'ছিছি ছিছি ছিছি / তুমি হে সম্রাট / এই কি তোমার রাজধরম। / কুলবধূ ছলে / গৃহেতে আনিয়া / বলে ধর তারে নাহি শরম।।' এছাড়া তীব্র দৃপ্ত ভাষায় উচ্চারণ করেছে – 'নারী পদাঘাতে / আজি ঘুরাইব / তব বীরপনা, ধরম চোর!' শেষপর্যন্ত রমনী উগ্রমূর্তিতে সম্রাটের অসি কেড়ে নিয়ে তাকে মারতে উদ্যত হলে সম্রাট বলতে বাধ্য হয়েছে নতস্বরে – 'মানিতেছি ঘাট / ধন্য সতী তুমি / রাখ তরবারি; মানিনু হারি।।' কবি বঙ্কিমচন্দ্র কুলরমনীরা চিরকাল রমনী হাটে লাজলজ্জা পরিত্যাগ করে বেচা-কেনা হতে থাকবে, এর বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠা করলেন আর্যনারী দৃপ্ততাকে নারীধর্মকে রক্ষা করার জন্য।

তাঁর 'মন এবং সুখ' সাধারণ প্রেমবিষয়ক কবিতা। মধুমাসে মধুর বাতাসে কৃষ্ণের বাঁশীর সুর ধ্বনিত হয় আবহমান কাল ধরে। তাঁর 'জলে ফুলে' কবিতায় কবি বলতে চেয়েছেন নদী যেমন পাহাড় থেকে উত্থিত হয়ে একদিন অনন্ত সাগরে মিশে যায়, যেমন ফুল সমস্ত সুগন্ধ দিয়ে, সৌন্দর্য বিতরণ করে অবশেষে অনন্ত সাগরে সম্মিলিত হওয়ার জন্য ভাসিয়ে দেয় নিজেকে, সেরূপ কবিও ফুলের মতো ভেসে যেতে চান অনন্ত সাগরে অন্তর্লীন হয়ে। তাই ফুলকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন – 'তুই যাবি ভেসে ফুল, আমি যাব ভেসে। / কেহ না ধরিবে তোরে, / কেহ না ধরিবে মোরে, অনন্ত সাগরে তুই, মিশাইবি শেষে। / চল যাই দুই জনে অনন্ত উদ্দেশে।' তাঁর 'ভাই ভাই' কবিতাটি বাঙালিদের উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক কবিতা। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালি হয়ে বাঙালিদের ভিক্ষাবৃত্তি, কর্মহীনতা, অতি সরল কোমল স্বভাবকে মেনে নিতে পারেন নি, যেমন য়ুরোপ, মার্কিন সর্বত্র বাঙালিদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশিত হয়েছে। তাদের জীবনে কোনো গভীর আশা নেই, কোনো গৌরব নেই। তাই বাঙালিদের প্রতি তীব্র আঘাত হেনেছেন আলোচ্য কবিতায়, যাতে তারা সুদৃঢ় হয়, মনোবল খুঁজে পায় এবং যেকোনো কাজে তাদের গৌরব অর্জন করতে পারে। তাই তিনি বাঙালীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন – 'কার উপকার করেছ সংসারে? / কোন্ ইতিহাসে তব নাম করে? / কোন্ বৈজ্ঞানিক বাঙালির ঘরে? / কোন্ রাজ্য তুমি করেছ জয়?' ... তাঁর 'দুর্গোৎসব' কবিতাটিও ব্যঙ্গ বিদ্রূপাত্মক কবিতা। বাঙালিরা দুর্গোৎসবের সময় আনন্দে মাতোয়ারা হয়, উৎসবানন্দে আত্মমগ্ন থাকে কিন্তু কবি বঙ্কিমচন্দ্র

আনন্দোৎসবের পরিবর্তে তাঁর কিছু প্রতিবাদের সুর ধ্বনি হয়েছে আলোচ্য কবিতায়। যেখানে সমস্ত বাঙালী ক্ষুধার্ত, অভাব অনটনে বিপর্যস্ত, সেখানে আনন্দ করার মতো মন ও মানসিকতা থাকে না। তাই কবি তীব্রভাবে সংহারিণী রাঙ্গতা পরা দেবীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন – 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, আজি তুমি রাঙ্গতা পরা, / ছিঁড়া ধুতি রিপু করা, ছেলের কপালে?' লক্ষ্মী দেবীকে উদ্দেশ করে বলেছেন – 'আমি বেটা লক্ষীছাড়া আমার ঘরে লক্ষী খাড়া, / ঘরে হতে খাই তাড়া, ঘর খরচ নাই।।' আবার সরস্বতীদেবীকে উদ্দেশ করে বলেছেন – 'চড়ে না ভাতের হাঁড়ি, / বিদ্যায় কাজ নাই।' সমাজে যেসব ক্ষুধাসুর সকলের অন্ন কেড়ে খায় তাদের দমনের জন্য কবি দৃঢ়তার সঙ্গে শান্তিরূপিনীকে জানিয়েছেন – 'মেরেছ তারকাসুর, / আজি বঙ্গ ক্ষুধাতুর, / মার দেখি, ক্ষুধাসুর, সমাজের রণে? / অসুরে করিয়া ফের, মায়ে পোয়ে মারলে ঢের, / মার দেখি এ অসুরে, ধরি ও চরণে।।' সমস্ত দেশে টাকার অভাবে ধ্বনিত হয়েছে বড় হাহাকার / তাই কবি শুভঙ্করীকে উদ্দেশ করে ব্যঙ্গার্থে বলেছেন – 'তুমি ধর্ম্ম তুমি অর্থ, / তার বুঝি এই অর্থ, / তুমি বা টাকারূপিনী ধরম টাকায়। / টাকা কাম, টাকা মোক্ষ, / রক্ষ মাতঃ রক্ষ রক্ষ, / টাকা দাও লক্ষ লক্ষ, / নৈলে প্রাণ যায়।' তাঁর 'রাজার ওপর রাজা' কবিতাটিও ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক কবিতা। মানুষ জীবনে বড় আশায় ঘর বাঁধে, সংসার ধর্ম, কাজকর্ম করে। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে সব নিরাশায় পরিণত হয়। এক মাত্র যারা ধর্মের কারবার করে তাদের কোনো লোকসান হয় না। তারা ধর্মের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করছে। এখানে ধর্মের নামে কারবারকে বিদ্রূপ করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক' গ্রন্থটির কবিতাংশ নিয়ে সংক্ষিপ্ত তাঁর কাব্য ভাবনা পর্যালোচনা করা সম্ভব হল। কিন্তু এই গ্রন্থে কিছু গদ্যও সংযুক্ত আছে। একই গ্রন্থে পদ্য ও গদ্য রাখার একটি মহৎ উদ্দেশ্য কবির ছিল। সে সম্পর্কে গ্রন্থটির ভূমিকায় তিনি যথার্থ উল্লেখ করেছেন – 'কবিতা পদ্যেই লিখিতে হইবে, তাহা সঙ্গত কিনা, আমার সন্দেহ আছে। ভরসা করি, অনেকেই জানেন যে, কেবল পদ্যই কাব্য নহে। আমার বিশেষ পদ্য কাব্যের উপযোগী হইতে পারে। কিন্তু অনেক স্থানে গদ্যের ব্যবহারই ভাল। যেস্থানে ভাষাভাবের গৌরবে আপনা-আপনি ছন্দে বিন্যস্ত হইতে চাহে, কেবল সেই স্থানেই পদ্য ব্যবহার্য। নহিলে কেবল কবি নাম কিনিবার জন্য ছন্দ মিলাইতে বসা এক প্রকার সং সাজিতে বসা। কাব্যের গদ্যের উপযোগিতার উদাহরণস্বরূপ তিনটি গদ্যকবিতা এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিলাম। অনেকে বলিবেন, এই গদ্যে কোন কবিত্ব নাই। সে কথায় আমার আপত্তি নাই। আমার উত্তর যে, এই গদ্য যেরূপ কবিত্বশূন্য, আমার পদ্যও তদ্রূপ। অতএব তুলনায় কোন ব্যাঘাত হইবে না।' অতএব পদ্য হলেই সবসময় কাব্য হয়ে উঠতে না পারে। কারণ যথার্থ কাব্যের শরীরে থাকে কাব্যের দর্শন। আবার অনেক গদ্যে ও কাব্যবৈশিষ্ট লক্ষণীয়। বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক গদ্যে কাব্যবৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। তাঁর 'মেঘ', 'বৃষ্টি', 'খদ্যোত' ইত্যাদি গদ্যকবিতা যথেষ্ট কাব্যগুণ সমৃদ্ধ। বিশেষত 'খাদ্যোত' কবিতায় এক গভীর কাব্যাদর্শ ফুটে উঠেছে। আমাদের জীবন তথা পৃথিবী অন্ধকারময়। জ্ঞানের দ্বারা, আবিষ্কারের দ্বারা প্রতিনিয়ত আলোকবর্তিকা প্রজ্জ্বলিত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র ও আলোচ্য কবিতায় অন্ধকারময় পৃথিবীকে অলোকিত করতে চান তাঁর কাব্যভাষায় – 'এই অন্ধকারে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া কাহার পথ আলো করিলাম? কে আমাকে, দেখিয়া, অন্ধকারে, দুস্তরে, প্রান্তরে, দুর্দিনে, বিপদে, বিপাকে চলিয়াছে, এস ভাই, চল চল, ঐ দেখ আলো জ্বলিতেছে, চল, ঐ আলো দেখিয়া পথ চল? অন্ধকার। এ পৃথিবী ভাই বড় অন্ধকার।' প্রসঙ্গক্রমে বলা ভালো, রবীন্দ্রনাথ নন, প্রকরণগতভাবে সচেতনভাবে বাংলা ভাষায় গদ্য কবিতা লেখেন বঙ্কিমচন্দ্রই।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলোতে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর কবি-প্রতিভার অভূতপূর্ব উচ্চারণ। তাঁর কাব্যপ্রতিভা কীভাবে তাঁর উপন্যাসগুলোতে প্রতিফলিত হয়েছে সে সম্পর্কে মোহিতলাল মজুমদার বলেছেন – 'অতিশয় অল্প বয়সে রচিত তাঁহার কবিতাগুলিতে যে একটি কল্পনা বা রস-প্রেরণার উন্মেষ দেখা যায় তাহাও যৌন আকর্ষণমূলক। তাহাতে অকালপক্কতার লক্ষণ আছে, ... উত্তরকালে সেই ধরণের কাব্যচর্চা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া, নবযুগের নব্য কাব্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র জীবনের যে দিকটিকে তাঁহার কবি-কল্পনার মধ্য উজ্জীবন রূপে আশ্রয় করিয়াছিলেন, এই কবিতাগুলির মধ্যে তাহার সুস্পষ্ট অঙ্কুর রহিয়াছে। নায়িকারূপিনী নারীর প্রতি এই যে আসক্তি, ইহাই তাঁহার জীবন-দর্শনের মূলসূত্ররূপে উপন্যাসগুলির সৃষ্টি-কল্পনায় অনুসৃত হইয়া আছে।' তাঁর গদ্যকাব্য-ধর্মী উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা'-য় এক অপূর্ব লাবণ্যে সুশোভিত নারীমূর্তি কপালকুন্ডলা বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যভাবনার অভূতপূর্ব নিদর্শন। তাঁর 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে ঘটেছে তাঁর কবি-প্রাণতার জাগরণ। তাঁর 'রজনী' উপন্যাসে শচীন্দ্র কানা ফুলওয়ালী রজনীর চোখ পরীক্ষার সময় তার চিবুক স্পর্শ করলে তখন রজনীর অন্তরে, স্পর্শ-সুখে প্লাবিত হয়েছিল কাব্যিক সুরেলা ধ্বনি – 'সে স্পর্শ পুষ্পময়। ... আমার আশেপাশে ফুল, আমার মাথায় ফুল, আমার পায়ে ফুল – আমার পরণে ফুল, আমার বুকের ভিতর ফুলের রাশি। আ মরি মরি! কোন বিধাতা এ কুসুমময় স্পর্শ গড়িয়াছিল।' তার 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে মাতৃবন্দনায় উত্থিত হয়েছে তাঁর কবিত্বের উচ্ছ্বাস। তাঁর 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে জলে-ডোবা মৃতপ্রায় রোহিনীর বর্ণনায় প্রকাশ পেয়েছে এক কাব্যিক জলজধ্বনি – 'মেঘে যেন জলবৃষ্টি করিতেছে। নয়ন মুদ্রিত; কিন্তু সেই মুদ্রিত পক্ষের উপরে ভ্রূযুগ জলে ভিজিয়া আরও অধিক কৃষ্ণ শোভায় শোভিত হইয়াছে। আর সেই ললাট-স্থির, বিস্তারিত, লজ্জাভয়হীন, কোন অব্যক্ত ভাববিশিষ্ট – গণ্ড এখনও উজ্জ্বল – অধর এখনও মধুময়, বান্ধুলীপুষ্পের লজ্জাস্থল।' তাঁর 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে কুন্দনন্দিনী সূর্যমুখীর গৃহত্যাগের পর নগেন্দ্রনাথের গভীর অন্ধকারে একাকী বসে থাকার মধ্যে গড়ে উঠেছে কবির কাব্যদৃষ্টির অস্ফুট বাক্‌ভঙ্গী। তাঁর 'সীতারাম' উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে বৃক্ষারূঢ়া শ্রীর মোহাবিষ্ট অনিন্দ্য কাব্যিক রূপের উচ্ছ্বাস। তাঁর 'কমলাকান্তের দপ্তর' উপন্যাসে পথিকের গানে আলোড়িত হয়েছে স্বপ্নাচারী কবিমানসের কাব্য-তরঙ্গ। কমলাকান্ত সম্পর্কে ড. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত বলেছেন – 'কমলাকান্তের সকল স্বপ্ন, সকল পাগলামির মধ্যে মনুষ্যজাতির প্রতি সুগভীর প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। কখনও ইহা উচ্চ কবিকল্পনায় উচ্ছ্বাসিত হইয়া উঠিয়াছে আবার কখনও ইহা ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের সাহায্যে

সরস হইয়াছে।'

এইভাবে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের কথাশিল্পের অক্ষরে অক্ষরে সর্বদা উজ্জীবিত হয়ে আছে তাঁর কাব্যশৈলীর অন্তর্নিহিত মনন দৃষ্টি। তিনি পাঠক সমাজে আজও সাহিত্যসম্রাট হিসাবে গভীরভাবে সমাদৃত। শুধু প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক হিসাবে নয়, একজন মননশীল প্রাবন্ধিক হিসেবে এবং সেই সঙ্গে বাল্যজীবন থেকে তাঁর হৃদয়ে কাব্যধর্মিতার অপরিমেয় প্রাণশক্তির নির্ঝরিণীর গীতিধ্বনির জন্য। তাই মোহিতলাল মজুমদার বঙ্কিমচন্দ্রের কবি-জীবন সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন – 'বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীর মধ্যে অতি বিশুদ্ধ ভাব-চিন্তা বা কেবল কবিজনসুলভ কল্পনারই অভিব্যক্তি ঘটে নাই। নিজের দেহমন প্রাণের গভীর ব্যক্তিগত উপলব্ধিই সেই রচনাকে প্রাণবন্ত করিয়াছে – ভাবুকের ভাববিলাস বা শিল্পীজনোচিত কলাকুতূহল চরিতার্থ করিবার জন্যই তিনি কুত্রাপি লেখনী ধারণ করেন নাই। অথচ তিনি একজন খুব বড় কাব্য স্রষ্টা কবি – বঙ্কিম প্রতিভার বৈশিষ্ট্য ইহাই।'

বঙ্কিমের কমলাকান্ত, কমলাকান্তের বঙ্কিম

ড. বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবন্ধের সংজ্ঞা-নির্ণয় করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'প্রকৃষ্ট বন্ধন' শব্দবন্ধটি ব্যবহার করেছিলেন। তথ্য-সংগ্রহ ও সংকলন এবং গৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে যুক্তি পরম্পরায় বক্তব্যের ইমারত গড়ে তোলা প্রবন্ধের ধর্ম। এই ধর্ম অনুসরণ করে বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্র'-র মতো একটি বই লিখেছেন, উপহার দিয়েছেন 'ধর্ম্মতত্ত্ব' ও 'শ্রীমদ্ভগবদগীতা'-র মতো বই, যা পাণ্ডিত্যের সঙ্গে অনুসন্ধিৎসার মেলবন্ধনে অসাধারণ হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি লিখেছেন 'কমলাকান্ত' যেটি চরিত্রগতভাবে না প্রবন্ধ, না নিবন্ধ, না রম্যরচনা। যে-কোনও দেশের সাহিত্যেই এমন কিছু বই লেখা হয় যেগুলি ভিন্ন-মার্গের পথিক। সেগুলি পূর্বসূরিদের অনুগমন করে না, উত্তরসূরিদের অনুকরণীয় কোনও সরণি নির্মাণ করেও যায় না। 'কমলাকান্ত' এমনই একটি ব্যতিক্রমী রচনা। 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'কমলাকান্তের পত্র' এবং 'কমলাকান্তের জোবানবন্দী' – এই তিন ভাগে বিন্যস্ত বইটি আগাগোড়া অন্যরকম।

বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন সরকারি চাকুরে। স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে অনেক বাধানিষেধ ও প্রতিকূলতার মধ্যে লিখতে হয়েছিল। রাজশক্তির রক্তচক্ষু উপেক্ষা করার শক্তি ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের, 'বন্দেমাতরম্'-এর মতো স্বদেশমন্ত্রগীতি রচনায় পিছপা হননি তিনি, দ্বিধা করেননি সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পটভূমিকায় 'আনন্দমঠ' লিখে স্বদেশভাবনার বিকাশ ঘটাতে। কাজেই তিনি যে কেবলমাত্র রাজরোষের ভ্রুকুটি থেকে বাঁচতেই কমলাকান্তকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছেন এমনটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। আমার মনে হয়, আফিমখোর কমলাকান্ত-র মুখে ব্যবস্থা-বিরোধী যে-কথাগুলি প্রচার করেছেন বঙ্কিম তা তাঁর মৌলিক ভাবনার বিশেষ একটি রীতি যা সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর স্বাতন্ত্র্যের সূচক হয়ে উঠেছে।

১৮৭৫ সালে প্রকাশিত হয় 'কমলাকান্তের দপ্তর'। বইটিতে প্রথমে এগারোটি লেখা ছিল। যদিও 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশের সময় 'কমলাকান্তের দপ্তর' শিরোনামে মোট চোদ্দটি লেখা বেরিয়েছিল কিন্তু বঙ্কিম জানিয়েছিলেন 'মশক', 'স্ত্রীলোকের রূপ' ও 'চন্দ্রালোকে' তাঁর লেখা নয়। টানা দশ বছর বইটি মানুষের মধ্যে বিপুল সাড়া জাগায়। ১৮৮৫-তে 'কমলাকান্তের পত্র' ও 'কমলাকান্তের জোবানবন্দী' যুক্ত হয়ে নতুন নামকরণ হয় 'কমলাকান্ত'। চার বছর পর (১৮৮৯ খৃ.) বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং 'ঢেঁকি' নামের আরও একটি লেখাযুক্ত বইটিতে মোট লেখার সংখ্যা দাঁড়ায় কুড়ি (দপ্তর ১৪, পত্র ৫, জোবানবন্দী ১)। পরিশিষ্টে যুক্ত হয় 'কাকাতুয়া'।

কমলাকান্তের প্রথম প্রকাশকাল ভারতবর্ষের ইতিহাসের বিশেষ একটি পর্বের ঘটনা। ১৮৫১-য় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত 'ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন' (National Association) থেকে শুরু করে ১৮৮৫-তে 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' (Indian National Congress) প্রতিষ্ঠার মধ্যবর্তী সময়ে 'হিন্দুমেলা'-র জাতীয়তাবাদী প্রেরণা তথা স্বদেশি সংগীতমালা, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর জ্বালাময়ী ভাষণসমূহ, 'বন্দেমাতরম্' সংগীত রচনা (১৮৭৫ খৃ.), অজস্র সামাজিক এবং জাতীয় আন্দোলনের পরিপার্শ্ব 'কমলাকান্ত' নামের এক বিস্ময়কর ছদ্মলেখকের হাত ধরে বাঙালি-মননে যেভাবে ঝড় তুলেছিল সে ইতিহাস কারও অজ্ঞাত নয়। পরিহাসছলে কমলাকান্ত যে-বিদ্রূপ শানিয়েছে তার উদ্দেশ্য স্বজাতিকে আঘাত করা নয়, ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি সংশোধন করে জাতিকে নতুন করে গড়ে তোলা, জাতীয় ইতিহাসকে নতুন ভাবে ও নতুন ছন্দে প্রবাহিত করা। এই কাজে সে সফল হয়েছে কেননা বঙ্কিমচন্দ্র নামের মনীষা তাঁর অন্তর্দৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন এক নতুন ভারতবর্ষ, যার মেধা ও মনন আবর্তিত হতে থাকবে যুক্তির সরণিতে, বোধ ও বোধির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় অগ্রসর হতে থাকবে সংস্কারমুক্ত এক ভবিতব্যের দিকে যেখানে মানুষ তার অনন্ত সম্ভাবনা নিয়ে বারেবারে ফিরে আসবে – আলস্য, পণ্ডিতম্মন্যতা, স্বার্থবোধ, অসূয়া, দলাদলি প্রভৃতির ঊর্ধ্বে উঠে নবতর জাতীয় চেতনার শরিক হয়ে উঠবে।

কমলাকান্ত চক্রবর্তীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন জনৈক ভীষ্মদেব খোশনবীস। কমলাকান্ত এক অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ, পাঁচজনে তাকে পাগল বলত কেননা 'সে কখন কি বলিত, কি করিত তাহার স্থিরতা ছিল না'। সে এক সওদাগরি অফিসে চাকরি জুটিয়েছিল কিন্তু কাজে বিন্দুমাত্র মন ছিল না। অফিসের চিঠিপত্রের উপরে সেক্ষপীয়র (Shakespear)-এর বচন উদ্ধৃত করা, বিলবহির ওপর ছবি আঁকা এমন অজস্র অকাজ তার মজ্জাগত ছিল। একবার সাহেব একটি পে-বিল তৈরি করতে বললে সে একটি ছবি আঁকল যে, কতকগুলো নাগা ফকির সাহেবের কাছে ভিক্ষে চাইছে আর সাহেব দু'চারটে পয়সা ছড়িয়ে ফেলে দিচ্ছেন। ছবির নিচে লিখে দিল যথার্থ পে-বিল। খোশনবীস জানিয়েছেন, 'সাহেব নূতনতর পে-বিল দেখিয়া কমলাকান্তকে মানে মানে বিদায় দিলেন'।

কমলাকান্ত খেয়াল-খুশির বশে নানা লেখা লিখত। সে সম্পর্কে খোশনবীস বলছেন,

'তাহার একটি দপ্তর ছিল। কমলাকান্তের কাছে ছেঁড়া কাগজ পড়িতে পাইত না; দেখিলেই তাহাতে কী মাথামুণ্ড লিখিত, কিছু বুঝিতে পারা যাইত না।... কাগজগুলি একখানি মসীচিত্রিত, পুরাতন, জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডে বাঁধা থাকিত।'

কমলাকান্ত অবিবাহিত। চাকরি খোয়ানোর পর সে কিছুদিন এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়ায়। খোশনবীসের বাড়িতেও ছিল কিছুদিন। তারপর একদিন হঠাৎই গেরুয়া পরে দেশান্তরী হয়। যাবার আগে সে 'দপ্তরটি' দিয়ে যায় খোশনবীসকে। এই 'অমূল্য রত্ন'-টি নিয়ে কী করবেন ভেবে পান না খোশনবীস, প্রথমে ভেবেছিলেন অগ্নিদেবকে উপহার দেবেন, পরে অন্য ভাবনা এল। কমলাকান্ত তার লেখাগুলি মাঝেমধ্যেই পড়ে শোনাত বন্ধুকে। শুনলেই ঘুম পেত খোশনবীসের। তাই তিনি ভাবলেন 'যে লোকোর উপকার না করে, তাহার বৃথায় জন্ম। এই দপ্তরটিতে অনিদ্রার অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ আছে – যিনি পড়িবেন, তাঁহারই নিদ্রা আসিবে। যাঁহারা অনিদ্রারোগে পীড়িত, তাঁহাদের উপকারার্থে আমি কমলাকান্তের রচনাগুলি প্রচারে প্রবৃত্ত হইলাম।'

কমলাকান্ত সরল মানুষ। তেমন কিছু চাহিদা ছিল না তার। একা মানুষ – 'স্বয়ং যেখানে হয়, দুইটি অন্ন এবং আধ ভরি আফিম পাইলেই হইত।' আফিমের মৌতাত চড়লে তার মাথায় নানা ভাবনা আসত। নেশাখোরেরা অনেক সময় অসংলগ্ন কথাবার্তা বলে। এমন লোকের কথায় গুরুত্ব না থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই-যে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ''বাজে কাজেই মানুষকে ঠিক-ঠিক চেনা যায়, তেমনই পাগলাটে ধরণের নেশাখোর মানুষটির লেখায় এমন অনেক বিষয় আছে যা আপাতত-শোভন সামাজিক ব্যবস্থার মুখোশ ছিঁড়ে দিতে পারে। তাই ভীষ্মদেব খোশনবীস কর্তৃক প্রচারিত কমলাকান্তের দপ্তর দূরদর্শী বঙ্কিমচন্দ্রের রসিক মনের সুনিশ্চিত অভিব্যক্তিরই প্রকাশ।

'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর প্রথম সংখ্যা – 'একা'। জ্যোৎস্না-প্লাবিত রাজপথে জনৈক পথিকের মধুর সংগীতে কমলাকান্তের নিরানন্দ হৃদয়ের তন্ত্রীতে-তন্ত্রীতে যে অনুরণন উঠেছিল তা তাকে সংসার-সংগীতের অভিমুখী করে তোলে। কমলাকান্তের জবানীতে বঙ্কিম শুনিয়েছেন সংসার-সংগীতের মর্মকথা ঃ 'প্রীতি সংসারে সর্বব্যাপিনী – ঈশ্বরই প্রীতি। প্রীতিই আমার কর্ণে এক্ষণকার সংসার-সংগীত। অনন্ত কাল সেই মহাসংগীত-সহিত মনুষ্য-হৃদয়-তন্ত্রী বাজিতে থাকুক। মনুষ্যজাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্য সুখ চাহি না।'

এমন চিরকালীন কথা কি পাগলের পক্ষে বলা সম্ভব? লালন গেয়েছিলেন 'আমি ছত্রিশ রকম পাগল দেখলাম, মনের মতো পাগল পাইলাম না', কমলাকান্ত সেই বিরল-শ্রেণীর পাগল যার মস্তিষ্কের কোষে-কোষে অনন্তের অজস্র আহ্বান। 'কে গায় ওই' – আত্ম-জিজ্ঞাসার জবাবে মানুষের প্রতি ভালোবাসার যে-বার্তা প্রচার করে সে, সুখের অন্যতর সংজ্ঞা-নির্ণয় করে, তা জাতীয়তাবাদী ভারতবর্ষের জাগরণী-মন্ত্রের সমার্থক। আবার দ্বিতীয় সংখ্যায় নানা শ্রেণির মানুষের সঙ্গে ফলের তুলনা টানতে গিয়ে সে যখন বিদেশ-থেকে-আনা সিবিল মার্চেন্টদের

প্রসঙ্গে বলেন 'সকলে আম্র খাইতে জানে না। সদ্য গাছ হইতে পাড়িয়া এ ফল খাইতে নাই। ইহা কিয়ৎক্ষণ সেলাম-জলে ফেলিয়া ঠাণ্ডা করিও-যদি জোটে, তবে সে জলে একটু খোশামোদের - বরফ দিও - বড় শীতল হইবে' – আমরা বিলক্ষণ বুঝতে পারি তোষামোদ-প্রিয় সাহেব এবং কর্তাভজা অধস্তন কর্মীদের নির্লজ্জ চাটুকারিতার মুখে তীব্র কশাঘাত হেনে বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের স্বদেশ-চেতনার উদ্‌বোধন ঘটাতে চেয়েছিলেন। তিনি যখন তথাকথিত দেশহিতৈষীদের শিমূল ফুল, অধ্যাপক ব্রাহ্মণদের ধুতুরা, লেখকদের তেঁতুল এবং দেশি হাকিমদের কুষ্মাণ্ডের সঙ্গে তুলনা করে বিশদ বিশ্লেষণে তাদের অপদার্থতার কথা বুঝিয়ে দেন, আমরা নিজেদের ভেতরটা স্পষ্ট দেখতে পাই এবং বিদ্রূপে জর্জরিত হয়ে নিজেদের ভাবনা ও প্রকৃতি সংশোধন করার কথা ভাবতে শুরু করি।

নসীরাম বাবুর বৈঠকখানায় নেশার ঘোরে কমলাকান্ত যখন একটি পতঙ্গের সঙ্গে আলোর কথোপকথন কান পেতে শোনে এবং উপলব্ধি করে আলোয় নিঃশর্ত আত্মাহুতিই পতঙ্গের একমাত্র অভিপ্রায়, সে-কারণে পিলসুজের অভ্যন্তরে মুখ-ঢাকা-আলোর প্রতি তার সবিশেষ অভিমান, সেই দারুণ মুহূর্তে তার মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠে বহ্নিময় সংসারের রূপ; জ্ঞান-বহ্নি; ধনবহ্নি; মানবহ্নি; রূপবহ্নি; ধর্মবহ্নি; ইন্দ্রিয়বহ্নি এমন হাজারো অগ্নির লেলিহান শিখা জগৎ সংসারকে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে পারছে না তাও অনুভব করে সে, কেননা সংসার একাধারে বহ্নিময় ও কাচময় – কাচ বা শিশার মধ্যে আগুন জ্বলছে পতঙ্গ যেমন সে আগুনে ঝাঁপ দিতে পারে না তেমনই নিজস্ব প্রতিরোধশক্তিতে সংসারও মানুষের ভিতরের যাবতীয় কালানল শোষণ করে সমতা বজায় রাখতে পারে। তুলনা ও প্রতি-তুলনার আশ্চর্য মুনশিয়ানায় কমলাকান্তের দপ্তরখানি (কাগজপত্রের বাণ্ডিল) অভূতপূর্ব ভাব-ব্যঞ্জনায় মূর্ত হয়ে ওঠে, বঙ্কিমচন্দ্রের স্বতন্ত্র বীক্ষা ও নিবিড় রসানুভূতি এক পৃথক জগতের অভিমুখে পাঠককে টেনে নিয়ে যায়।

'ইউটিলিটি বা উদর-দর্শন' লেখাটি আবার অন্যরকম। 'ইউটিলিটি' শব্দটিকে বঙ্কিম এভাবে ভেঙেছেন – ইউ + টিল + ইট + ই অর্থাৎ তোমরা চাষ করে খাও। বাঙালি ভোজনরসিক। তাই উদরপূর্তির মধ্যেই পুরুষার্থের সন্ধান করেছেন লেখক। আধিভৌতিক উদরপূর্তি হল ভাত, ডাল, সবজি, মিস্টি প্রভৃতি ভৌতিক সামগ্রী দিয়ে পেট ভরানো, আধিদৈবিক উদরপূর্তির অর্থ দৈবীকৃপায় প্লীহা ও যকৃৎ বড় হওয়া এবং বড়লোকের কথায় লুব্ধ হয়ে কালযাপন আধ্যাত্মিক উদরপূর্তির উদাহরণ।

পণ্ডিতেরা যে দু'টি পুরুষার্থের কথা বলে থাকেন কমলাকান্তের দৃষ্টিতে তা নতুন ব্যঞ্জনা খুঁজে পেয়েছে। যেমন বিদ্যা – এটি বাঙালির স্বতঃসিদ্ধ, বিদ্যালাভের জন্যে লেখাপড়া শেখার কোনও প্রয়োজন নেই। বুদ্ধি কী? কমলাকান্ত নামের অতুলনীয় পাগলাটি বলে 'যে আশ্চর্য শক্তিদ্বারা তুলাকে লৌহ, লৌহকে তুলা বিবেচনা হয়, সেই শক্তিকেই বুদ্ধি বলে।' এইভাবে আহার-নিদ্রা, ধূমপান, খোশগল্পকে 'পরিশ্রম', চাটুকারিতাকে উপাসনা, বিক্রেতা-চিকিৎসক-ধর্মোপদেষ্টার কাজকে 'প্রতারণা' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। দু'প্রকার বল বা শক্তির কথাও

শুনিয়েছে কমলাকান্ত। মৌখিক বল হল নিন্দা, গালিগালাজ, অভিসম্পাত, কিল-চড় দেখানো 'হাস্ত' (হাতের) বল, 'পাদ' বল পালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা, 'চাক্ষুষ' অর্থে কান্নাকাটি, 'ত্বাচ' অর্থে মার খাওয়ার শক্তি এবং 'মানস বল' বলতে দ্বেষ, ঈর্ষা, হিংসা প্রভৃতি বোঝানো হয়েছে।

যিনি স্বজাতিকে যথার্থ ভালোবাসবেন তিনি কখনই আপনজনের দোষত্রুটিগুলি দেখে নীরব থাকবেন না। সাতকোটি বাঙালির মানুষ-না হয়ে উঠার কষ্টে আক্ষেপ করেছেন রবীন্দ্রনাথ, হতভাগ্য জাতির জন্য বল ও বীর্য প্রার্থনা করেছেন স্বামীজি, ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতার চেয়েও মনুষ্যত্বকে বড় করে দেখেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। বঙ্কিমচন্দ্রও এই কাজটিই করেছেন। উনিশ শতকের মধ্যবিত্ত বাঙালি যেভাবে ভাবের ঘরে চুরি করে আত্মশ্লাঘা বোধ করত তার মর্মে আঘাত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেই কমলাকান্তের কলমে স্বপ্রকাশ হয়েছেন তিনি।

'আমার মন' নামের লেখাটিতে মনের বহুবিচিত্র গতি সরস দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেছেন বঙ্কিম। মনের লঘুতা ও অস্থিরতা এবং 'সংসারে মন বাঁধা' দেওয়ার বিপুল প্রণোদন সত্ত্বেও কমলাকান্ত অনুসন্ধান করে দেখেছে যে, 'পরের জন্য আত্মবিসর্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের অন্য কোনো মূল নাই। ধন, যশঃ, ইন্দ্রিয়াদিলব্ধ সুখ আছে বটে, কিন্তু তাহা স্থায়ী নহে।' আত্মমুখিনতা থেকে পরার্থপরতার দিকে মানুষেকে নিয়ে যাওয়ার একটা চেষ্টা দেখতে পাই এই বিশ্লেষণে, যে-চেষ্টার মধ্যে উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের বীজটি দেখতে পাওয়া আদৌ অসম্ভব নয়।

মরালীর বঙ্কিম গ্রীবা, সুন্দরীর বঙ্কিম নয়ন, ত্রিভঙ্গমুরারীর দণ্ডায়মান বঙ্কিম রীতির মতোই কমলাকান্তের বাচন বঙ্কিম হলেও গভীর ও মনোমুগ্ধকর। সে যখন বসন্তের কোকিলের ডাক শুনে তার উদ্দেশে বলে 'রাগ করিও না – তোমার মতো আমাদের মাঝখানে অনেক আছেন। যখন নসীবাবুর তালুকের খাজনা আসে, তখন মানুষ-কোকিলে তাঁহার গৃহকুঞ্জ ভরিয়া যায় – কত টিকি, ফোঁটা, তেড়ি, চশমার হাট লাগিয়া যায় . . . – আর যে রাত্রে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতেছিল, আর নসীবাবুর পুত্রটির অকালে মৃত্যু হইল তখন তিনি একটি লোক পাইলেন না' – এই বাস্তবতা বঙ্কিম হলেও বর্ণনার গুণে অনন্য। কমলাকান্ত যখন বলে '. . . মনের কথা এ জন্মে বলা হইল না – যদি কোকিলের কণ্ঠ পাই – অমানুষী ভাষা পাই আর নক্ষত্রদিগকে শ্রোতা পাই, তবে মনের কথা বলি', সেই অনুপম মুহূর্তে বুঝতে পারি বাস্তব যখন পিছু হটতে-হটতে আরও একবার ঘুরে দাঁড়িয়ে সুন্দরের হাত ধরে, নক্ষত্রলোকের ভাষা জেগে ওঠে অনন্তের শরীরে।

'আমার দুর্গোৎসব'-এ মহাসপ্তমীর দিন আফিমের মাত্রা বেশি হওয়ায় কমলাকান্ত যখন দেখে 'দিঙ্মণ্ডলে প্রভাতারুণোদয়বৎ লোহিতোজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হইল . . . সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশির উপরে, দূরপ্রান্তে দেখিলাম – সুবর্ণমণ্ডিতা, এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা! জলে হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে! এই কি মা! হাঁ, এই মা, চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি, বিলক্ষণ বুঝতে পারি বঙ্কিমচন্দ্র স্বাদেশিকতার উদ্‌বোধনই চাইছেন, মৃন্ময়ী প্রতিমা যে জন্মভূমির চিন্ময়ী রূপের সঙ্গে একাকার, সেই বোধের

মহাউদ্‌বোধনে নবজাগরণের বীজমন্ত্রটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চাইছেন। 'জয় জয় জয় জয় জয়দাত্রি / জয় জয় জয় বঙ্গজগদ্ধাত্রি' – এই দুই চরণে সেই আকাঙ্ক্ষার সদর্থকতাই প্রকাশিত।

'বিড়াল' শীর্ষক লেখাটি আমাদের তরুণ হৃদয়কে যেমন উদ্বুদ্ধ করেছিল, আজকের প্রজন্মের ছেলেমেয়েরাও এটি পড়লে অনুপ্রাণিত হবেন, তাদের দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটবে। ওয়েলিংটনের বিড়ালত্ব প্রাপ্তির কথা পরিহাসছলে বলে কমলাকান্ত যেমন তার অকুতোভয় স্বভাবের পরিচয় রেখেছে তেমনই বিড়ালের মুখে 'তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্যজাতির রোগ' এবংবিধ প্রবাদকথার পাশাপাশি 'সমাজের ধনবৃদ্ধির অর্থ ধনীর ধনবৃদ্ধি, ধনীর ধনবৃদ্ধি না হইলে দরিদ্রের কি ক্ষতি' – এহেন সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা প্রচার করে 'কমলাকান্তের দপ্তর' যে ভাবান্দোলন প্রচার করেছে, মানবসভ্যতার অগ্রগমনে তার মূল্য অসীম। 'বিড়াল' বাংলা গদ্যসাহিত্যে একটি স্বতন্ত্র ভাবের প্রতীক, যা সৃজনের মৌলিকতায় নতুন একটি ঘরানা নির্মাণ করতে পেরেছে।

ঢেঁকির রূপকল্পে কমলাকান্ত যেভাবে ঢেঁকির আত্মনিবেদিত ভাবটির সঙ্গে public spirit-কে মিলিয়ে দেখতে চেয়েছে এবং বলেছে '...পরহিতেচ্ছা, দেশবাৎসল্য 'সাধারণ আত্মা' অর্থাৎ public spirit, বিশেষত-কার্যদক্ষতা, এ সকল খানায় পড়িলে হয় কি না? যদি না হয় তবে ঢেঁকির এ কার্যদক্ষতা, এ মহাবল কোথা হইতে আসিল', আমরা বিস্মিত হয়ে লক্ষ করি, বঙ্কিমচন্দ্র কী অনায়াস ও অতুলনীয় শক্তিতে অসাধ্যসাধন করেছেন – একটি ভাবের সঙ্গে আর একটি ভাবের সাযুজ্য নির্মাণ করে নির্মাণ-বিনির্মাণের একীকরণ করে গদ্যসাহিত্যের পরিধি বিস্তার করেছেন।

কমলাকান্ত নামের খ্যাপাটে মানুষটি যখন চিঠিপত্র লেখে, সেখানেও অজস্র মণিমুক্তা আমাদের বিমোহিত করে। কমলাকান্ত মোট পাঁচটি চিঠি লিখেছে। প্রথমটি 'বঙ্গদর্শন'-এর সম্পাদককে। সে জানতে চেয়েছে 'বঙ্গদর্শন' নামের ঠিক-ঠিক অর্থ কী – বঙ্গদেশ দর্শন না 'পূর্ব-বাঙ্গালা দর্শন করিবার বিধি' অথবা শ-কারের ওপর 'রেফ' বর্জন করে বঙ্গদশন বা বাংলার দাঁত। কী ধরণের লেখা তাঁর পছন্দ তা-ও জানতে চেয়েছে কমলাকান্ত, গুরু বিষয় না লঘু, ঐতিহাসিক গবেষণা না সংক্ষিপ্ত সমালোচনা, কোটেশ্যন অথবা ফুটনোট, নবেল, কাব্য কিংবা কমলাকান্তীয় রচনা – ঠিকমতো আফিম জোগাতে পারলে কোনও লেখাতেই আপত্তি নেই অদ্ভুত এই লেখকের।

এই চিঠির মধ্যে দিয়ে বঙ্কিম অদ্ভুত পরিহাস করেছেন। তিনি নিজে সব্যসাচী লেখক, কোনও লেখাতেই অপারঙ্গমতা ছিল না তাঁর। কিন্তু কমলাকান্তের চিঠিতে যেভাবে অর্ডারি লেখার প্রতি স্বচ্ছন্দ পক্ষপাত লক্ষ করা গেছে তা বহুপ্রসূ লেখকবর্গের প্রতি অগ্রজ লেখকের প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপেরই প্রকাশ। পাশাপাশি 'বঙ্গদর্শন'-সম্পাদক (সে সময়ে কাগজটির সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) যখন কমলাকান্তের পত্রের জবাবে তার দাবি মেনে পরিমাণ মতো আফিম পাঠিয়ে বলেন 'তুমি কিছু পলিটিক্স্ ঝাড়িলে ভালো হয়', আমরা

বুঝতে পারি লেখা বাজারজাত করার কৌশল 'বঙ্গদর্শন'-সম্পাদকের অনায়ত্ত ছিল না। কিছু কটু কথা বললেও কমলাকান্ত যে অর্ডারি-লেখায় অনীহা দেখায় নি তা প্রমাণ করে সাহিত্যের পণ্যায়ন নজর এড়ায় নি বঙ্কিমের। কমলাকান্তের লেখাগুলিতে যদিও সাহিত্যগুণের খামতি দেখা যায় নি তথাপি আজ্ঞাবাহী লেখকের ভবিতব্য কমলাকান্তের চিঠিতে প্রচ্ছন্ন পরিহাসের মতো ফুটে উঠেছে।

'কিছু পলিটিক্স্ ঝাড়িলে ভালো হয়'-এই কথাটির মধ্যেই কী সুতীব্র শ্লেষ। 'লোকরহস্য' (প্রথম প্রকাশ ১৮৭৪ খৃ.)-এর অন্তর্গত 'ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহলাঙ্গুল', 'বাবু' প্রভৃতি লেখায় বঙ্কিমচন্দ্র কৌতুক ও রহস্যের আবরণে বাঙালী জাতির মজ্জাগত স্বভাব-বৈগুণ্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। 'মুচিরাম গুড়ের জীবন-চরিত' এ দেখেছি পেস্কারি কাজে ঘুষের টাকা প্রচুর বলে ডিপুটিগিরি করতে মন চাইছে না মুচিরামের। 'বঙ্গদর্শন'-এর তরফে অনুরুদ্ধ (আদিষ্ট!) হয়ে কমলাকান্ত লিখল, 'ভাই পলিটিক্স্ওয়ালারা, আমি কমলাকান্ত চক্রবর্তী তোমাদিগের হিতবাক্য বলিতেছি, পিয়াদার শ্বশুরবাড়ি আছে, তবু সপ্তাদশ অশ্বারোহী মাত্র যে জাতিকে জয় করিয়াছিল তাহার পলিটিক্স্ নাই। 'জয় রাধে কৃষ্ণ! ভিক্ষা দাও গো!' ইহাই তাহাদের পলিটিক্স্। তদ্ভিন্ন অন্য পলিটিক্স্ যে-গাছে ফলে, তাহার বীজ এ দেশের মাটিতে লাগিবার সম্ভাবনা নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র জানতেন ইংরেজরা এদেশের ইতিহাস লিখতে বসে ইচ্ছাকৃতভাবে নানা বিকৃতি ঘটিয়েছিলেন। আঠারোজন অশ্বারোহী হঠাৎই ধেয়ে এল আর লক্ষণ সেন এঁটো হাতে খিড়কির দরজা দিয়ে পালালেন – এই গল্প বিশ্বাস করতেন না তিনি। তবে কেন কমলাকান্তের মুখে সেই বিকৃত ইতিহাসের পুনরুল্লেখ করলেন? এর কারণ এই যে, অষ্টাদশ অশ্বারোহীর গল্পটি সত্যি না হলেও জাতিগতভাবে বাঙালি তথা ভারতীয়রা যে দুর্বল এবং ভঙ্গুর তা তিনি জানতেন। ইংরেজের কাছে আবেদন ও নিবেদনের কাপুরুষোচিত প্রস্তাবাবলী পছন্দ ছিল না তাঁর, তাই কমলাকান্তের মুখে ভিক্ষার্থীর পলিটিক্স্-এর কথা বসিয়েছেন। এই রাজনীতি যে আদৌ কাজের নয় – ঠারে ঠোরে তা বুঝিয়ে দিয়েছেন।

কুক্কুরজাতীয় ও বৃষজাতীয় – এই দু'প্রকার পলিটিক্স্ এর কথা বলেছে কমলাকান্ত। প্রথমটি আবেদন-নিবেদন প্রসূত, দ্বিতীয়টি গা-জোয়ারির। কোনটি ভালো, কোনটি বা মন্দ সে-বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেনি সে, কিন্তু আমরা বুঝতে পারি কোনওটিতেই যেন সায় নেই কমলাকান্তর। পরবর্তী চিঠিতে (তৃতীয় সংখ্যা – বাঙালির মনুষ্যত্ব) সে যখন একঝাঁক ভ্রমরের অবিরাম গুণগুনানিতে ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে ওঠে এবং প্রতিবাদ করতে গিয়ে ভ্রমরদের মুখে বাঙালির ঘ্যানঘ্যানানির (বাঙালি হইয়া কে ঘ্যান্ঘ্যানানি ছাড়া? কোন্ বাঙালির ঘ্যান্ঘ্যানানি ছাড়া অন্য ব্যবসা আছে?) কথা শোনে এবং সবিস্তারে তা বর্ণনা করে, আমরা বুঝতে পারি, জাতীয় জীবনে আমাদের ক্ষীণপ্রাণতা কমলাকান্ত চক্রবর্তী নামের শিরদাঁড়াওয়ালা মানুষটিকে নিদারুণ ব্যথিত করেছিল, 'তোমরা না জান শুধু মধু সংগ্রহ করতে, না জান হুল ফুটাইতে – কেবল ঘ্যান্ঘ্যান্ পার। একটা কাজের সঙ্গে খোঁজ নাই – কেবল কাঁদুনে মেয়ের মতো

দিবা-রাত্রি ঘ্যান্‌ঘ্যান্‌। একটু বকাবকি লেখালিখি কম করিয়া কিছু কাজে মন দাও – তোমাদের শ্রীবৃদ্ধি হইবে। মধু করিতে শেখ – হুল ফুটাইতে শেখ' – ভ্রমরের মুখে শোনা এই কথাগুলি কি আজও আমাদের নতুন করে ভাবায় না? জাতির আচারগত ও ভাবগত ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি লোকের কাছে তুলে ধরে বঙ্কিমচন্দ্র মোটেই আত্মপ্রসাদ লাভ করেন নি, বরং বাঙালি জাতি যাতে এই বিচ্যুতিগুলো সংশোধন করে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে সেটাই তাঁর কাছে অভিপ্রেত ছিল।

পঞ্চম সংখ্যায় বিদায় নেবার আগে চতুর্থ সংখ্যাটিতে কমলাকান্ত 'বুড়া বয়সের কথা' লিখেছে। বিগত যৌবন হলে মানুষ ঝড়ের এঁটো পাতাটির মতো – সদা প্রত্যাখ্যাত, অবহেলিত। সংসারে তার কিছুমাত্র মূল্য নেই, মানুষ হিসেবে সামান্যতম কদরও নেই। এই বয়স অতএব বিষাদের, বানপ্রস্থ কিংবা সন্ন্যাসের। কালিদাসকে উদ্ধৃত করে কমলাকান্ত এই বয়সের মানুষজনকে 'মুনিবৃত্তি' অবলম্বন করতে বলেছেন। মুনিবৃত্তি বলতে সে বুঝিয়েছে পরোপকার। বলেছে – 'আপনার কাজ ফুরায় না, যদি মনুষ্যজীবন লক্ষ বর্ষ পরিমিত হইত, তবু আপনার কাজ ফুরাইত না – মানুষের স্বার্থপরতার সীমা নাই – অন্ত নাই। বার্ধক্যে আপনার কাজ ফুরাইযাছে বিবেচনা করিয়া পরহিতে রত হও।... এই মুনিবৃত্তি অবলম্বন কর।

বঙ্কিম জানতেন 'বুড়া বয়সে' পরহিতের কথা বললে বিস্তর আপত্তি উঠবে। ঈশ্বরকে ডাকার দোহাই পেড়ে অলস জাতি পরহিতকর কর্মপ্রবাহ থেকে সরে থাকতে চাইবে। এই প্রবণতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কমলাকান্ত দৃঢ় প্রত্যয়ে বলেছে, 'যদি বল, বার্ধক্যেও যদি আপনার জন্য হউক, পরের জন্য হউক, বিষয়-কার্যে নিরত থাকিব, তবে ঈশ্বরচিন্তা করিব কবে? – পরকালের কাজ করিব কবে? আমি বলি, আশৈশব পরকালের কাজ করিবে, শৈশব হইতে জগদীশ্বরকে হৃদয়ে প্রধান স্থান দিবে। যে কাজ সকল কাজের উপর কাজ, তাহা প্রাচীন কালের জন্য তুলিয়া রাখিবে কেন? শৈশবে, কৈশোরে, যৌবনে, বার্ধক্যে, সকল সময়েই ঈশ্বরকে ডাকিবে। ইহার জন্য বিশেষ অবসরের প্রয়োজন নাই – ইহার জন্য অন্য কোনো কার্যের ক্ষতি নাই। বরং দেখিবে ঈশ্বরভক্তির সঙ্গে মিলিত হইলে সকল কার্যই মঙ্গলপ্রদ, যশস্কর এবং পরিশুদ্ধ হয়।'

এখানে কমলাকান্তের জবানীতে যে-তত্ত্বকথা প্রচার করেছেন বঙ্কিম তা ভারতবর্ষের ধর্মভাবনার সূত্র-সংযোগে মহীয়ান। জীবনের চতুর্থ পর্যায়টি ধর্মচর্চার জন্য নির্দিষ্ট, আগের-আগের পর্যায়ে তার কোনও প্রয়োজন নেই – এমন তত্ত্বের পিছনে সারবান কোনও যুক্তি নেই, বুড়ো বয়সে পরহিতব্রত গ্রহণ করা যাবে না কেননা সেটি ঈশ্বরের স্মরণ-মনন ও পূজা-আরাধনার কাল – এই যুক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বঙ্কিমচন্দ্র গীতার কর্মকৌশলের কথাটিই নিজের মতো করে পেশ করেছেন। ঈশ্বরকে যদি আমরা সর্বত্র প্রত্যক্ষ করতে পারি এবং প্রতিটি কাজের সঙ্গে তাঁকে যুক্ত করতে পারি তবে যাবতীয় কর্মপ্রণোদন 'মঙ্গলপ্রদ, যশস্কর ও পরিশুদ্ধ' হয়ে ওঠা সম্ভব। এর অর্থ এই যে, ঈশ্বর যেহেতু একটি মঙ্গলময় সত্তার প্রতিরূপ, ঈশ্বরীয় ভাবনা অতএব মঙ্গল ও শুদ্ধতার সমার্থক। আমরা যদি প্রতিদিনের কাজগুলিকে নিছক কাজ হিসেবে

দেখি তা কখনই গতিময় ও সুন্দর হয়ে উঠবে না কিন্তু প্রতিটি কাজের সঙ্গে মঙ্গলময় ঈশ্বরের ধারণাটি যুক্ত করে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'-র তত্ত্বসাধনা করতে পারলে তা অন্যতম ঐশ্বর্যে মণ্ডিত হয়ে উঠবে। যাঁরা নিরীশ্বরবাদী তাঁরা নিশ্চয়ই এই তত্ত্বে সায় দেবেন না, কিন্তু ভারতীয় দর্শন প্রাচীন কাল থেকেই কর্মকে উপাসনায় পরিণত করার লক্ষ্যে নিঃস্বার্থ সেবা ও ঈশ্বরাভিমুখী কর্মকাণ্ডের পক্ষে সওয়াল করেছে। সেই মতটি সমর্থন করেই বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তের জবানীতে কর্মযোগের রহস্যটি ব্যাখ্যা করেছেন।

'কমলাকান্ত' শিরোনামে শেষ লেখা 'কমলাকান্তের জোবানবন্দী'। দীর্ঘদিন প্রশাসনে উচ্চপদে যুক্ত ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালীন সময়ে আইনি কার্য-পরম্পরার সঙ্গে নিবিড় পরিচয় ঘটেছিল তাঁর। ফলে আইনের ফাঁক-ফোকরগুলি তিনি ভালোই জানতেন। গোরুচুরির মোকদ্দমায় সাক্ষীর কাটারায় পুরে দেওয়া হয়েছে কমলাকান্তকে। ফরিয়াদী প্রসন্ন গোয়ালিনী, যার গোরুর দুগ্ধধারার স্বাদ ও গন্ধের সঙ্গে সাক্ষীর বহুদিনের পরিচয়। সাক্ষীটি বড়ই বেয়াড়া। ঘেরাটোপের মধ্যে হাঁটুকাঁপার বান্দা নয় সে। মুহুরি যখন তাকে হলফ পড়াতে গিয়ে বলে 'বল, আমি পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া' . . . তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করে সে বলে ওঠে 'সাক্ষ্য দিতে-দিতে দুই একটা ছোট রকম মিথ্যা বলি, না হয় বলিলাম – কিন্তু গোড়াতেই একটা বড় মিথ্যা বলিয়া আরম্ভ করিব, সেটা কী ভালো!' কথাটা কেন-যে মিথ্যে মুহুরি তা বুঝতে পারে না। পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা সাধারণ মানুষের সাধ্যাতীত অথচ তাঁকে 'প্রত্যক্ষ' জেনেই হলফ পাঠ করার অর্থ বড় একটা মিথ্যাচারণ – সাক্ষীর হলফনামায় এহেন অসংগতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। বয়স জিগ্যেস করায় কমলাকান্ত যেভাবে মাস দিন ঘণ্টা মিনিটের হিসাব দিতে বসে, পেশার কথা জিগ্যেস করলে বলে 'আমি উকিল না বেশ্যা যে আমার পেশা আছে' এবং 'খাও কি করিয়া' – এই প্রশ্নের জবাবে 'ভাতের সঙ্গে ডাল মাখিয়া, দক্ষিণ হস্তে গ্রাস তুলিয়া, মুখে পুরিয়া গলাধঃকরণ'-এর কথা জানান দেয়, গোরু চেনার কথায় আদালতের সামনের মাঠে খুঁটি-বাঁধা গোরুটিকে দেখে শামলা-পরা উকিলদের সঙ্গে তুলনা করে এবং জরিমানা অথবা কয়েদের কথায় হাকিমকে নাস্তানাবুদ করে তা প্রচলিত ব্যবস্থার গলদগুলোকেই বড় করে দেখায়।

কমলাকান্ত তার নিজস্ব ঢঙে জবানবন্দি দেয়। 'গোরু কার' – সরলরৈখিক এই প্রশ্নের উত্তরে বলে 'গোরু প্রথম বয়সে গুরুমহাশয়ের, মধ্যবয়সে স্ত্রীজাতির, শেষ বয়সে উত্তরাধিকারীর, দড়ি ছিঁড়িবার সময়ে কারও নয়।' গোরুচোরকে যে ছেড়ে দেওয়া উচিত সে বিষয়ে সওয়াল করে বলে ''পূর্বকালে মহারাজ শ্যেনজিৎকে এক ব্রাহ্মণ বলিয়াছিল যে, 'বৎস, গোপস্বামী ও তস্কর, ইহাদের মধ্যে যে ধেনুর দুগ্ধ পান করে সেই তাহার যথার্থ অধিকারী। অন্যের তাহার উপর মমতা প্রকাশ করা বিড়ম্বনা মাত্র। এই হলো ভীষ্মদেব ঠাকুরের Hindu Law। আর ইহাই এখনকার ইউরোপের 'International Law'।

কমলাকান্ত যখন অভুক্ত মানুষকে কেড়ে খাওয়ার পরামর্শ দেয় তা আমাদের সমাজের পক্ষে বেমানান মনে হয়। তবে একথাও ঠিক যে, ক্রমাগত শোষিত হতে-হতে সাধারণ মানুষ

যখন ঘুরে দাঁড়ায় তা কখনও-কখনও ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করে এবং অতি-বিপ্লবের চেহারা নেয়। এই বিপ্লব মানুষকে কোনও জায়গায় পৌঁছে দেয় না, কেননা ধ্বংসাত্মক আন্দোলন কখনই একটি আদর্শ সমাজ গড়ে তুলতে পারে না। তথাপি বিড়াল-এর প্রতীকে বঙ্কিমচন্দ্র যখন ধনের কেন্দ্রীকরণের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলেন তা বুঝতে সাহায্য করে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় লালিত না হয়েও বঙ্কিমচন্দ্র নামের দূরদর্শী মানুষটি বিশেষ কোনও মতপথের গণ্ডিতে বাঁধা পড়েন নি, মতাদর্শগত কেন্দ্রিকরণের পরোয়া না করেই বিবেকের অনুশাসন মেনে চলেছেন বলে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি কোথাও ব্যাহত বা খর্ব হয়নি।

'কমলাকান্ত' শীর্ষক বইটির পরিশিষ্টে 'কাকাতুয়া' নামে যে লেখাটি সংযোজিত হয়েছে তা বড়ই বিচিত্র। প্রসন্ন গোয়ালিনী কমলাকান্তকে দুধ দিত কিন্তু এর বাইরেও দুজনের একটা সম্পর্ক ছিল। প্রসন্ন, যখন একটা পাখি পুষে তাকে নিয়ে নানা আহ্লাদ শুরু করল কমলাকান্তের ভারী অভিমান হল, কেননা 'খাঁচার পাখি' হিসেবে পক্ষীত্বে তার বিলক্ষণ দাবি ছিল। প্রসন্ন গোয়ালিনীর সঙ্গে জেদাজেদি করে কমলাকান্ত একটা পাখি পুষল। সেই পাখি সদাসর্বদা 'plateetud' শব্দটি উচ্চরণ করত। কমলাকান্ত যখন জানতে পারল 'plantain' থেকে এই শব্দের উৎপত্তি, সে ভাবল হয়তো বা খাদ্যাভ্যাসের অনুসূত্রে তার এই শব্দচয়ন কিন্তু পাখি জানাল সে এদেশের যথাসর্বস্ব লুঠ করে খায়, তাই দু পেয়ে জন্তুগুলোর ভাগ্যে plantain ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। কমলাকান্ত আমাদের জানিয়ে দেয়, পাখির ভাঁড় থেকে ফোঁটা ফোঁটা দুধ টসে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে পিপীলিকার মতো 'বঙ্গজগুলা কিল্ কিল্ করিয়া মারামারি ঠেলাঠেলি করিয়া' এই দুধ খেতে আসে। তাদের মধ্যে যারা বুদ্ধিমান তারা কাকাতুয়ার পায়ে মাথা খুঁড়ে-খুঁড়ে মাথা ফুলিয়ে বড়সড় করে ফেলেছে এবং নিরন্তর সেলাম করে পাখির 'প্রসাদের সারাংশ সংগ্রহ করিয়া দূরস্থিত ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বঙ্গজদের দলে প্রবেশ করিয়া মোটা মাথা উন্নত করিয়া বেড়াইতেছে।'

আমরা আগেই বলেছি, স্বজাতির দৈন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে অসম্ভব পীড়িত করত। বঙ্গজেরা ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে ছন্নছাড়া হাঘরের মতো এক ফোঁটা দুধের প্রত্যাশী হয়ে রয়েছে, এমন একটি ছবি কল্পনা করে তিনি নিশ্চয়ই আহ্লাদিত হননি। কমলাকান্ত যেহেতু সামাজিকতার ধার ধারত না, তাই তার পক্ষে এমন একটি চিত্রায়ন সহজ হয়েছে। তার লেখাগুলি আরও একবার পড়তে পড়তে তাই মনে হচ্ছে বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তকে আশ্রয় করেছিলেন না কমলাকান্ত বঙ্কিমকে – সেই প্রশ্নের জুতসই একটা জবাব পাওয়া দরকার। আমার ধারণা, একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠেছে বলেই বাংলা সাহিত্য এক অনুপম ভাবব্যঞ্জনার ঐশ্বর্য আত্মস্থ করেছে যা তির্যকতার গুণে বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গনে চিরস্থায়ী আসন করে নিতে পেরেছে। বঙ্কিমের যেমন মৃত্যু নেই, মৃত্যু নেই কমলাকান্তেরও। পরস্পরের ভাবনামিলনে আমরা যে সম্পদ লাভ করেছি তা জাতি হিসেবে আমাদের গর্বিত ও অনুপ্রাণিত করেছে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ ঃ সৌহার্দ্য থেকে বিতর্কে

অলক মণ্ডল

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-১৮৯৪) রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) থেকে ছিলেন তেইশ বছরের বড়। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় এগারো বছর বয়সে। রবীন্দ্রনাথের যখন এগারো বছর বয়স (১৮৭২ সালে)। তখন বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশিত হয় (১৮৭২ সালের এপ্রিল থেকে)। রবীন্দ্রনাথের সেই অল্পবয়সের স্মৃতি, পরের বঙ্কিমের স্নেহ ও সান্নিধ্য তাঁকে সারা জীবন বঙ্কিম প্রশস্তি রচনায় প্রণোদিত করেছে। 'বঙ্গদর্শন'-এর প্রথম সংখ্যা থেকেই ধারাবাহিকভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটি বালক রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করে। স্মৃতিরঞ্জিত বঙ্কিম রচনা-পাঠের কাহিনী রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে তাঁর স্মৃতিকথা 'জীবনস্মৃতি' (১৯১৩) ও 'ছেলেবেলা' (১৯৪০)-তে উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের পড়া প্রথম ধারাবাহিক উপন্যাসের লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের পরে বাংলার সাহিত্যাকাশে প্রধান লেখক রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'-তে লিখেছেন – 'অবশেষে বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন আসিয়া বাঙালির হৃদয় একেবারে লুট করিয়া লইল। একে একে তাহার জন্য মাসান্তের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতাম, তাহার পরে বড়োদলের পড়ার শেষের জন্য অপেক্ষা করা আরও বেশী দুঃসহ হইত।" আবার 'ছেলেবেলা'তে লিখেছেন – "তখন বঙ্গদর্শনের ধূম লেগেছে – সূর্যমুখী আর কুন্দনন্দিনী আপন লোকের মত আনাগোনা করছে ঘরে ঘরে। কী হল, কী হবে, দেশসুদ্ধ সবার এই ভাবনা। বঙ্গদর্শন এসে পড়ায় দুপুর

বেলায় কারো ঘুম থাকত না। আমার সুবিধে ছিল, কাড়াকাড়ি করবার দরকার হত না – কেননা, আমার একটি গুণ ছিল – আমি ভালো পড়ে শোনাতে পারতুম। আপন মনে পড়ার চেয়ে আমার পড়া শুনতে বউঠাকুরুণ ভালোবাসতেন।"

পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ যখন বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি পড়েছেন তখন অল্পকথায় সেগুলির কথা তুলে ধরেছেন – ১. "আমার মনে পড়িতে লাগিল, অল্প বয়সে যখন রবিবারে স্কুলের ছুটির দিন অন্তঃপুরে নির্জন ছাদে বসিয়া কপালকুণ্ডলা পড়িয়াছিলাম তখন কেমন লাগিয়াছিল – কোথাকার এক পথবিহীন বনচ্ছায়াঘন কল্পনালোক হইতে উদভ্রান্ত সৌন্দর্য সমীরণ আসিয়া নগরবাসী বালকের বিস্মিত হৃদয়কে পুলকিত ব্যাকুলতায় পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছিল। মনে পড়িতে লাগিল, যখন মাসে মাসে আনন্দের আগ্রহে অন্তঃকরণ কিরূপ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিত। চারাগাছ যেরূপ প্রতিরাত্রি অবসানে নূতন জাগ্রতার সহিত সূর্যলোক পান করিতে থাকে, মাসান্তে বঙ্গদর্শনের অভ্যুদয়ে সেইরূপ ঔৎসুক্যের সহিত মুকুলিত অন্তরের প্রত্যেক উন্মুখ অগ্রভাগের দ্বারা আনন্দ-রশ্মি গ্রহণ করিতে থাকিতাম।" (রাজসিংহ, সাধনা, চৈত্র ১৩০০)

২. বিষবৃক্ষে কাহিনী এসে পৌঁছল আখ্যানে। যে-পরিচয় নিয়ে সে এল তা আছে আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে। সাহিত্য থেকে অস্পষ্টতার আবরণ এক পর্দা উঠে গেল – ক্ল্যাসিক্যাল অস্পষ্টতা বা রোমান্টিক অস্পষ্টতা অর্থাৎ ধ্রুপদী বা খেয়ালী দূরত্ব, সীতার বনবাসের ছাঁদ বা রাজপুত কাহিনীতে ছাঁদ। . . . বিজয়বসন্তেও একদিন বাঙালি পাঠক সন্তুষ্ট ছিল, তখন সে জানত না গল্পে এর চেয়ে স্পষ্টতর জগৎ আছে। তারপরে দুর্গেশনন্দিনীতে চমক লাগল, এটা তার কাছে অভূতপূর্ব দান। কিন্তু তখনো ঠিক চশমাটি সে পায়নি, তবু দুঃখ ছিল না। কেননা জানত না যে সে পায়নি। এমন সময়েই বিষবৃক্ষ দেখা দিল। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' সেই জাতেরই, সে যেন আরো স্পষ্ট।

৩. তারপরে এলেন প্রচারক বঙ্কিম। আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম, একে একে আসরে এসে উপস্থিত, গল্প বলবার জন্যে নয়, উপদেশ দেবার জন্য। আবার অস্পষ্টতা সাধু অভিপ্রায়ের গৌরবগর্বে সাহিত্য উচ্চ আসন অধিকার করে বসল। (শরৎচন্দ্র, প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৩৮) অর্থাৎ শৈশব কাল থেকে বঙ্কিমচন্দ্র মাসের পর মাস এসেছেন রবীন্দ্রের পাঠকক্ষে।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রথম দেখেন পনেরো বছর বয়সে ১৮৭৬ সালের ৩১ জানুয়ারি (১৮ মাঘ ১২৮২) সরস্বতী পূজোর দিন কলেজ রি-ইউনিয়ন উপলক্ষে মরকতকুঞ্জের অনুষ্ঠিত উৎসবে। সে এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। 'জীবন-স্মৃতি'তে সে অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ – "তাঁহাকে যখন প্রথম দেখি সে অনেক দিনের কথা। তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন ছাত্রেরা মিলিয়া, একটা বার্ষিক সম্মিলনী স্থাপন করিয়াছিলেন। চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। বোধ করি তিনি আশা করিয়াছিলেন, কোন এক দূর ভবিষ্যতে আমিও তাঁহাদের এই সম্মিলনীতে অধিকার লাভ করিতে পারিব। সেই ভরসায় আমাকেও মিলন সভায় কি একটা কবিতা পড়িবার ভার দিয়াছিলেন।... সেই সম্মিলন

সভার ভিড়ের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে নানা লোকের মধ্যে হঠাৎ এমন একজনকে দেখিলাম, যিনি সকলের হইতে স্বতন্ত্র – যাঁহাকে অন্য পাঁচজনের সঙ্গে মিশাইয়া ফেলিবার জো নাই। সেই গৌরকান্তি দীর্ঘকায় পুরুষের মুখের মধ্যে এমন একটা দৃপ্ত তেজ দেখিলাম যে, তাঁহার পরিচয় জানিবার কৌতূহল সম্বরণ করিতে পারিলাম না। সেদিনকার এত লোকের মধ্যে কেবলমাত্র, তিনি কে, ইহাই জানিবার তরে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, যখন উত্তর শুনিলাম, তিনিই বঙ্কিমবাবু, তখন বড় বিস্ময় জন্মিল। লেখা পড়িয়া একদিন যাঁহাকে মহৎ বলিয়া জানিতাম, চেহারাতেও তাঁহার বিশিষ্টতার যে এমন একটি নিশ্চিত পরিচয় আছে, সে কথা সেদিন আমার মনে খুব লাগিয়াছিল। বঙ্কিমবাবুর খড়্গ নাসায়, তাঁহার চাপা ঠোঁটে, তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তারি একটা প্রবলতর লক্ষণ ছিল।

বক্ষের উপর দুই হাত বদ্ধ করিয়া তিনি যেন সকলের নিকট হইতে পৃথক হইয়া চলিতেছিলেন; কাহারও সঙ্গে যেন তাঁহার কিছুমাত্র গা-ঘেঁষাঘেষি ছিল না। এইটেই সর্বাপেক্ষা বেশি করিয়া আমার চোখে ঠেকিয়াছিল। তাঁহার যে কেবলমাত্র বুদ্ধিশালী মননশীল লেখকের ভাব, তাহা নহে, তাঁহার ললাটে যেন একটি অদৃশ্য রাজতিলক পরানো ছিল।"

অর্থাৎ কিশোর রবীন্দ্রনাথের চোখে বঙ্কিমচন্দ্র অসাধারণরূপে প্রতিভাত হয়েছেন। চেহারায়, অসাধারণ, স্বাতন্ত্র্যে অসাধারণ, রুচিতে অসাধারণ, প্রথম দর্শনেই রবীন্দ্রনাথ তাই বিস্মিত হয়েছেন, মুগ্ধ হয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনে' তখন ছাপা হয়ে গেছে 'বিষবৃক্ষ', 'ইন্দিরা', 'যুগলাঙ্গুরীয়', 'চন্দ্রশেখর', 'রজনী' ও 'রাধারাণী'। ১২৮২ পৌষ থেকে শুরু হয়েছে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাস। ১২৭৯ বৈশাখ থেকে ১২৮২ মাঘ – এই ছেচল্লিশ মাসে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন ছটি উপন্যাস, এবং অজস্র প্রবন্ধ, নিবন্ধ, সমালোচনা ও সামান্য কয়েকটি কবিতা। এদিকে ১২৮২-র অগ্রহায়ণে রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন সবে চোদ্দ বছর সাত মাস তখন 'জ্ঞানাঙ্কুর' ও 'প্রতিবিম্ব' মাসিকপত্রে রবীন্দ্রনাথের 'বনফুল' নামের ধারাবাহিক, কাব্যোপন্যাস প্রকাশিত হচ্ছে।

তারপর 'বঙ্গদর্শন' ও 'ভারতী' দুই-পত্রিকায় দুই প্রধান লেখকের বিরামহীন সৃষ্টিশীল সাহিত্যকর্ম চলেছে। সাহিত্যসম্রাট ও 'বঙ্গদর্শন'-এর সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রথম কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করে বিস্ময় বিমুগ্ধ হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু তাঁর সঙ্গে কোনো কথা বলার সুযোগ ঘটেনি রবীন্দ্রনাথের। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের প্রথম তেত্রিশ বছর কাছে পেয়েছিলেন। এই প্রাপ্তি রবীন্দ্রনাথের জীবনের পক্ষে ছিল মস্ত বড় সঞ্চয়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন – "বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যের প্রভাতের সূর্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃদপদ্ম সেই প্রথম উদ্‌ঘাটিত হইল। পূর্বে কী ছিল এবং পরে কী পাইলাম তাহা দুই কালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি – কোথায় গেল সেই 'বিজয়বসন্ত', সেই 'গোলেবকাওলি', সেই বালক ভুলানো কথা – কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সংগীত, এত বৈচিত্র্য। বঙ্গদর্শন যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মতো 'সমাগতো

রাজবদুন্নতধ্বনিঃ'। বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।"

রবীন্দ্রসাহিত্যধারা প্রথমে সমান্তরালভাবে, পরে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী পথে অগ্রসর হয়েছে। ফলে বঙ্কিমের রীতিনীতি মতপথ পরিত্যাগ করে রবীন্দ্রনাথ অগ্রসর হয়েছেন।

১২৮৭ বঙ্গাব্দের ১৬ ফাল্গুন (১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৮১) জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে বিদ্বজ্জন-সমাগম সভার বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি-প্রতিভা' গীতিনাট্যের অভিনয় হয়। দর্শক হিসেবে গণ্যমান্য আরও অনেকের সঙ্গে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র 'বাল্মীকি প্রতিভা'-র রচনা কৌশলে এবং বাল্মীকির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের অভিনয় দর্শনে প্রীত হয়েছিলেন। সেদিনও বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কোনও আলাপ পরিচয় হয়নি। 'বাল্মীকি প্রতিভা'-র অভিনয়ের কিছুদিন পরে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করেন। পরিচয়ের সূত্র ধরেই রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ হয়েছেন। ১৮৮১ সালের সেপ্টেম্বরে বঙ্কিমচন্দ্র হাওড়ায় (হাওড়ার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন) থেকে কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংসে বেঙ্গল গভর্নমেন্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারির পদে বৃত হন। এ সময় তিনি ৯২ নং বউবাজার স্ট্রিটে থাকতেন। তাঁর বাসায় প্রায়-সন্ধ্যায় সাহিত্যিকদের আসর বসতো। তাতে মাঝে মাঝ যেতেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর আর রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ ক্রমশ বঙ্কিমচন্দ্রের স্নেহভাজন হয়ে ওঠেন।

১৮৮২ সালের ২৩ জানুয়ারি (১১ মাঘ ১২৮৮) আদি ব্রাহ্মসমাজের ৫২তম বাৎসরিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বঙ্কিমচন্দ্র এসেছিলেন।

১২৮৯ বঙ্গাব্দের ২ শ্রাবণ (১৭ জুলাই, ১৮৮২) জোড়াসাঁকোয় কলিকাতায় সারস্বত সমাজের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সারস্বত সমাজের যে কার্যকরী সমিতি গঠিত হয় তাতে পুরাতত্ত্ববিদ রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে সভাপতি এবং বঙ্কিমচন্দ্র, সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সহ-সভাপতি করা হয়। সম্পাদক হন রবীন্দ্রনাথ ও কৃষ্ণবিহারী সেন। সারস্বত সমাজের কাজকর্ম পরিচালনা সূত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়।

৫ জুলাই, ১৮৮২ (১২৮৯ বঙ্গাব্দের ২২ আষাঢ়) রবীন্দ্রনাথের নতুন কাব্যগ্রন্থ 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' প্রকাশিত হয়। কাব্যগ্রন্থটির জন্য রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে সম্মানিত হন। ১২৮৯-এর শ্রাবণ মাসে রমেশচন্দ্র দত্তের জ্যেষ্ঠা কন্যা কমলার বিয়েতে রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্র উভয়েই নিমন্ত্রিত হন। এই নিমন্ত্রণ সভাতেই বঙ্কিমচন্দ্র নিজের গলার ফুলের মালাটি তরুণ রবীন্দ্রের কণ্ঠে পরিয়ে দিয়েছিলেন।

এই ঘটনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন – 'বিবাহ সভার দ্বারের কাছে বঙ্কিমবাবু দাঁড়াইয়া ছিলেন। রমেশবাবু বঙ্কিমবাবুর গলায় মালা পরাইতে উদ্যত হইতেছেন, এমন সময় আমি সেখানে উপস্থিত হইলাম। বঙ্কিমবাবু তাড়াতাড়ি সে-মালা আমার গলায় দিয়া বলিলেন – 'এ মালা ইহারই প্রাপ্য। রমেশ, তুমি সন্ধ্যাসংগীত পড়িয়াছ? তিনি বলিলেন –

'না'। তখন সন্ধ্যাসংগীতের কোনো কবিতা সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত করিলেন, তাহাতে আমি পুরস্কৃত হইয়াছিলাম।"

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন –"সেই আমার জীবনের সাহিত্যচর্চার প্রথম গৌরবের দিন।" এরপর থেকে আর রবীন্দ্রনাথকে কোনোদিন পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি এবং এরপর থেকে বঙ্কিমচন্দ্রও বরাবরই রবীন্দ্রনাথকে সমমর্যাদা দিয়েই দেখেছেন, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরে কবি নবীন চন্দ্র সেন বঙ্কিমচন্দ্রের বাসায় দেখা করতে গেলে কথা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁকে বলেন, 'তোমাদের পরিচয় হওয়া উচিত।'He is a talented young man'।

১৮৮৩ সালের জানুয়ারিতে রবীন্দ্রনাথের 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাস প্রকাশিত হলে বঙ্কিমচন্দ্র নিজের থেকে একটি প্রশংসাপত্র লিখে লেখককে পাঠিয়েছিলেন। সেদিন আর কোনো লেখককে এভাবে স্বতপ্রণোদিত হয়ে অভিনন্দন জানাননি বঙ্কিমচন্দ্র। ১২৯৯ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় 'সাধনা' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি পাঠ করে বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লেখেন – "পৌষ মাসের সাধনায় প্রকাশিত শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটি আমি দুইবার পাঠ করিয়াছি। প্রতি ছত্রে আপনার সঙ্গে আমার মতের ঐক্য আছে। এ বিষয়ে আমি অনেকবার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকটে উত্থাপিত করিয়াছিলাম, এবং একদিন সেনেট হলে দাঁড়াইয়া কিছু বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।" (সাধনা, চৈত্র, ১২৯৯)

১৮৯৩-এর আগস্ট মাসে (ভাদ্র ১৩০০) কলকাতার তদানীন্তন জেনারেল অ্যাসেম্বলিজ ইনস্টিটিউশনের (বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজ) হলে রবীন্দ্রনাথ "ইংরাজ ও ভারতবাসী" নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি প্রবন্ধটি প্রশংসা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে লিখেছেন – "... সেদিন তিনি আমার প্রবন্ধ শ্রবণ করিয়া সমাদর সহকারে আমার বক্তৃতার স্থলে সভাপতি হইতে স্বীকার করিলেন; সে সৌভাগ্য অন্য লোকের পক্ষে এমন বিরল ছিল এবং সেই সমাদর বাক্য এমন অন্তরের সহিত উচ্চারিত হইয়াছিল যে আজ তাহা লইয়া সর্বসমক্ষে গর্ব করিলে ভরসা করি, সকলে আমাকে মার্জনা করিবেন। ... সেই সকল উৎসাহবাক্য সাহিত্য – পথযাত্রার মহামূল্য পাথেয় স্বরূপে আমার স্মৃতিভাণ্ডারে সাদরে রক্ষিত হইল।"

তবে বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক রচনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনে আপত্তি ছিল। যেমন, 'বঙ্কিমবাবুর কবিতা-পুস্তক আমাদিগের ভাল লাগিল না... বঙ্কিমবাবুর কোনো গ্রন্থই যে এরূপ নীরস, নির্জীব, স্বাদগন্ধহীন – কিছুই না – হইবে, তাহা আমরা কখনও স্বপ্নেও ভাবি নাই।' (ভারতী, ভাদ্র, ১২৮৫)।

বঙ্কিমচন্দ্রের পরিণত বয়সের রচনা সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথ কখনও অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তরুণ রবীন্দ্রনাথের প্রতি স্নেহপরায়ণ বঙ্কিমচন্দ্র কিছুটা তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ ভঙ্গীতে "আদি ব্রাহ্মসমাজও নব হিন্দু সম্প্রদায় (প্রচার, শ্রাবণ ১২৯১) প্রবন্ধটি লেখেন, কারণ 'এই রবির পিছনে একটি বড় ছায়া দেখিতেছি।'

রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে (নব্যভারত, ভাদ্র ১৩৩০) জানিয়েছেন – "বঙ্কিমের আনন্দমঠে হোক বা দেবী চৌধুরাণীতে হোক বঙ্কিম কী পরিমাণ ইংরাজরাজত্ব স্বীকার করেছেন কী পরিমাণ করেননি সে-সব তর্কের কথা রসের কথা নয়।' 'সেখানেই আমি বঙ্কিমের কাছে কৃতজ্ঞ যেখানে মেসেজ দেননি, যেখানে উনি আপনার সৃষ্টি করবার আনন্দকে রূপদান করেছেন।"

বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা দুটি প্রবন্ধ নিয়ে ('হিন্দুধর্ম' ও 'ধর্মজিজ্ঞাসা') রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের যে মসীযুদ্ধ হয় তাতে রবীন্দ্ররচনার গুরুত্ব ও মূল্যেরই স্বীকৃতি মেলে। রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য – "এই বিরোধের অবসানে বঙ্কিমবাবু আমাকে যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হারাইয়া গিয়াছে – যদি থাকিত তবে পাঠকেরা দেখিতে পাইতেন বঙ্কিমবাবু কেমন সম্পূর্ণ ক্ষমার সহিত এই বিরোধের কাঁটাটুকু উৎপাটন করিয়া ফেলিয়াছিলেন।" বিরোধ অবসানের পরে বঙ্কিমচন্দ্র 'প্রচার' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন'-এ বা 'প্রচার'-এ এটাই রবীন্দ্রনাথের একমাত্র লেখা। ১২৯১ মাঘ সংখ্যার (১৮৮৫) 'প্রচার'-এ 'মথুরায়' শিরোনামে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসটি প্রকাশিত হবার পর রবীন্দ্রনাথ বিরূপ সমালোচনা করলেও নিজে সুর দিয়ে সেই গান (বন্দেমাতরম) গেয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে শুনিয়েছিলেন এবং বঙ্কিমচন্দ্র সেই গান শুনে খুব খুশি হয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১৮৯৪ সালে। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স তেত্রিশ। তখন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা চৌত্রিশ। তাদের কয়েকটি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমতও জেনেছি। যেমন হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বাল্মীকির জয়' বইয়ের সমালোচনা উপলক্ষে বঙ্গদর্শনে (১২৮৮ আশ্বিন) বঙ্কিমচন্দ্রের রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি প্রতিভা' সম্বন্ধে একটি মন্তব্য ছিল, 'যাঁহারা বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাল্মীকি প্রতিভা' পড়িয়াছেন বা তাহার অভিনয় দেখিয়াছেন তাহারা কবিতার জন্মবৃত্তান্ত কখনো ভুলিতে পারিবেন না।"

রবীন্দ্রনাথ যে নানাভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে ঋণী সেকথা নানা জায়গায় স্বীকার করেছেন। যেমন, 'জীবনস্মৃতি'র 'বঙ্কিমচন্দ্র' অধ্যায়ে এবং 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে তার কিছু পরিচয় পেয়েছি। ঘনিষ্ঠ পরিচয়সূত্রে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়বত্তা ও মানসিক ঔদার্যের পরিচয় পেয়েছিলেন। লেখক হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে 'মহৎ'। এছাড়া বঙ্কিম-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকাকে রবীন্দ্রনাথ নিছক একটি উন্নতমানের পত্রিকা হিসেবেই দেখেননি, দেখেছেন প্রবল সাহিত্য-আন্দোলনের উৎসরূপে। বঙ্গদর্শনের অনন্যতা প্রদর্শনে রবীন্দ্রনাথের উক্তি যথাযথ। যেমন, 'শিক্ষার হেরফের' (১২৯৯) প্রবন্ধে বঙ্গদর্শনকে অবলম্বন করিয়া একটি প্রবল প্রতিভা আমাদের ইংরেজি শিক্ষা ও আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যবর্তী ব্যবধান ভাঙিয়া দিয়াছিল বহুকাল পরে প্রাণের সহিত ভাবের একটি আনন্দ সম্মিলন সংঘটন করিয়াছিল'। প্রবল প্রতিভাটি বঙ্কিমচন্দ্রের।

'পূর্ব ও পশ্চিম' প্রবন্ধেও পূর্ব-পশ্চিমের মিলন সাধনে বঙ্গদর্শনের ভূমিকা গুরুত্বের কথা

রবীন্দ্রনাথ স্মরণ করেছেন – "একদিন বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে যেদিন অকস্মাৎ পূর্ব পশ্চিমের মিলন যজ্ঞ আহ্বান করিলেন – সেইদিন হইতে বঙ্গসাহিত্য মহাকালের অভিপ্রায়ে যোগদান করিয়া সার্থকতার পথে দাঁড়াইল। বঙ্গসাহিত্য যে দেখিতে দেখিতে এমন বৃদ্ধিলাভ করিয়া উঠিতেছে। তাহার কারণ এ সাহিত্য কৃত্রিম বন্ধন ছেদন করিয়াছে, যাহাতে বিশ্ব সাহিত্যের সহিত ইহার ঐক্যের পথ বাধাগ্রস্ত না হয়। ইহা ক্রমশই এমন করিয়া রচিত হইয়া উঠিয়াছে, যাহাতে পশ্চিমের জ্ঞান ও ভাব ইহা সহজে আপনারই করিয়া গ্রহণ করিতে পারে।" স্মরণযোগ্য যে রবীন্দ্রনাথ একদা নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনা করেছেন (১৩০৮-১৩১২)। নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন'-এর প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার 'সূচনায়' (বৈশাখ ১৩০৮) রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে লিখেছিলেন – "যে নামকে বঙ্কিমচন্দ্র গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন, সে নামের মধ্যে সেই স্বর্গীয় প্রতিভার একটি শক্তি রহিয়া গিয়াছে। সেই শক্তি এখনও বঙ্গদেশ ও বঙ্গসাহিত্যের ব্যবহারে লাগিবে। সেই শক্তিকে আমরা বিনাশ হইতে দিতে পারি না।

বর্তমানে ও ভবিষ্যতে এ পত্রের সম্পাদক যিনিই হউন না কেন 'বঙ্গদর্শন' নামের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং বিরাজ করিতেছেন।.... সম্পাদক একথা ভুলিতে পরিবেন না যে, বঙ্গদর্শনের নামের মধ্যে বঙ্কিম স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আছেন। সেই বঙ্কিমের কঠিন আদর্শ ও কঠোর বিচার তাঁহাকে সর্বপ্রকার শৈথিল্য হইতে রক্ষা করিবে।... লোকমনো-মোহিনী বহুমুখী প্রতিভার বলে বঙ্গদর্শন প্রতিষ্ঠিত। মঙ্গলময়ের মঙ্গলাশীর্বাদে সে প্রতিষ্ঠা রক্ষিত হউক।"

রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল থেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের পাঠক ছিলেন। একথা রবীন্দ্রনাথ নানা প্রসঙ্গে অনেকবারই বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় 'মেঘনাদবধ' কাব্য সমালোচনা প্রসঙ্গে এবং 'বাউলের গান' নামে প্রবন্ধে। দুটিই 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়েছিল। 'বাউলের গান' প্রকাশিত হয় ১২৯০-এ বৈশাখে (১৮৮৩ সালে), এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লেখেন – "বঙ্কিমবাবু যখন দুর্গেশনন্দিনী লেখেন তখন তিনি যথার্থ নিজেকে আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। লেখা ভাল হইয়াছে, কিন্তু উক্ত গ্রন্থে সর্বত্র তিনি তাঁহার নিজের সুর ভাল করিয়া লাগাইতে পারেন নাই। কেহ যদি প্রমাণ করে যে, কোন একটি ক্ষমতাশালী লেখক অন্য একটি উপন্যাস অনুবাদ বা রূপান্তরিত করিয়া দুর্গেশনন্দিনী রচনা করিয়াছেন, তবে তাহা শুনিয়া আমরা নিতান্ত আশ্চর্য হইব না। কিন্তু কেহ যদি বলে বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর বা বঙ্কিমবাবুর শেষ বেলাকার লেখাগুলি অনুকরণ তবে সে কথা আমরা কানেই আনি না।'

বঙ্গদর্শনের মধ্যে দিয়েই বঙ্কিমের উপন্যাস শিল্পের বিবর্তন দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বঙ্গদর্শনের আগে ও বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত বঙ্কিমের উপন্যাসে একটা বড়ো চরিত্রগত পার্থক্য ছিল। আগের উপন্যাস ছিল রোমান্স জাতীয়। পরের উপন্যাস অভিজ্ঞতাজাত 'আখ্যান'।

১৯৩১ সালে লেখা প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন – 'বঙ্গদর্শনে যে জিনিসটা সেদিন

বাংলাদেশের ঘরে ঘরে সকলের মনকে নাড়া দিয়েছিল সে হচ্ছে বিষবৃক্ষ। এর পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী থেকে দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী লেখা বেরিয়েছিল। কিন্তু সেগুলি ছিল কাহিনী। ইংরেজিতে বলে রোমান্স। আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রা থেকে দূরে এদের ভূমিকা। সেই দূরত্বই এদের মুখ্য উপকরণ ...।

বঙ্কিমচন্দ্রের গোড়ার দিকের তিনটে কাহিনী যেন দৃঢ় অবলম্বন পায়নি, তাদের সাজসজ্জা আছে, কিন্তু পরিচয় নেই তারা ইতিহাসের ভাঙা ভেলা আঁকড়ে ভেসে এসেছে। তাদের বিনা তর্কে মেনে নিতে হয়, কেননা তারা বর্তমানের সামগ্রী নয়, তারা যে অতীতে বিরাজ করে সে অতীতকে ইতিহাসের আদর্শেও সওয়াল-জবাব করা চলে না, আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার আদর্শেও নয়। সেখানে বিমলা আয়েষা জগৎসিংহ কপালকুণ্ডলা নবকুমার প্রমুখেরা যা খুশী তাই করতে পারে, কেবল তাদের এইটুকু বাঁচিয়ে চলতে হয় যে পাঠকদের মনোরঞ্জনের ত্রুটি না ঘটে।

বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাসশ্রিত উপন্যাস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ অনুৎসাহী ছিলেন সেকথা বঙ্কিমের জীবিতকালেই তিনি প্রকারান্তরে জানিয়েছিলেন শ্রীশ মজুমদারকে লেখা চিঠিতে (১৮৮৮ সালে) – "আপনি কোনরকম ঐতিহাসিক বা ঔপদেশিক বিড়ম্বনায় যাবেন না – সরল মানবহৃদয়ের মধ্যে যে গভীরতা আছে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখদুঃখপূর্ণ মানবের দৈনন্দিন জীবনের যে চিরানন্দময় ইতিহাস তাই আপনি দেখাবেন। কোনোরকম জটিলতা বা চরিত্র বিশ্লেষণ বা দুর্দান্ত অসাধারণ হৃদয়াবেগ এনে স্বচ্ছ মধুর শান্তিময় ঘটনাস্রোতকে ঘোলা করে তুলবেন না।"

১৩০০ বঙ্গাব্দের চৈত্রসংখ্যা 'সাধনা' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' উপন্যাসের সমালোচনা করেন। সমালোচনা প্রবন্ধটি পরবর্তীকালে 'রাজসিংহ' নামে 'আধুনিক সাহিত্য' (১৯০৭) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথের সুগভীর রসবোধ ও তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের মতে, গতিবাহুল্য এ উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এবং "এই অনিবার্য অগ্রসরগতি সঞ্চার করিবার জন্য বঙ্কিমবাবু তাঁহার প্রত্যেক পরিচ্ছেদ হইতে সমস্ত অনাবশ্যক ভাব দূরে ফেলিয়া দিয়াছেন। অনাবশ্যক কেন, অনেক আবশ্যক ভারও বর্জন করিয়াছেন, কেবল অত্যাবশ্যকটুকু রাখিয়াছেন মাত্র। সেইজন্য রাজসিংহ প্রথম পড়িতে পড়িতে মনে হয় সহসা এই উপন্যাস জগৎ হইতে মাধ্যাকর্ষণশক্তির প্রভাব যেন আনেকটা হ্রাস হইয়া গিয়াছে। আমাদিগকে যেখানে কষ্টে চলিতে হয় এই উপন্যাসের লোকেরা সেখানে লাফাইয়া চলিতে পারে। রাজসিংহের গল্পটা সৈন্যদলের চলার মতো, ঘটনাগুলো বিচিত্র ব্যূহ রচনা করিয়া বৃহৎ আকারে চলিয়াছে। এই সৈন্যদলের নায়ক যাঁহারা তাঁহারাও সমান বেগে চলিয়াছেন, নিজের সুখ-দুঃখের খাতিরে কোথাও বেশিক্ষণ থামিতে পারিতেছেন না। নির্মলকুমারী-মানিকলাল তাই প্রণয় সম্ভাষণের অবকাশ পায় না, চঞ্চলকুমারী-রাজসিংহের প্রেম হয় 'বাহুল্যবর্জিত, সংক্ষিপ্ত ও সংহত। অকস্মাৎ মৃত্যুর দোলায় সকলেই যেন সজাগ। সম্রাটদুহিতা বেদনাশয্যায় শয়ান, দস্যু হয় বীর, রূপমুগ্ধ প্রেমিক আত্মবিসর্জন করে। 'রাজসিংহ' দ্বিতীয় 'বিষবৃক্ষ' নয়। 'রাজসিংহ' ঐতিহাসিক উপন্যাস,

বিষবৃক্ষ পারিবারিক উপন্যাস। 'রাজসিংহ' উপন্যাসের নিয়ন্ত্রা মহাকাল, 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে ব্যক্তির প্রাধান্য। উভয় উপন্যাসের বুনুনিতে পার্থক্য আছে। বিষবৃক্ষের বীজ ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয়, পল্লবিত হয়। কিন্তু দ্রুততাই রাজসিংহের বৈশিষ্ট্য।

রবীন্দ্রনাথের এই সমালোচনাটি একটি মহৎ সৃষ্টিকর্ম হিসেবে আজও বিবেচিত হয়।

'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসকে রোমান্স বললেও কপালকুণ্ডলার প্রভাব রবীন্দ্রনাথের উপর পড়েছিল। তাঁর প্রথম কাব্যোপন্যাস 'বনফুলে'র (১৮৮০) কমলাচরিত্রে কপালকুণ্ডলার ছায়া স্পষ্ট। গবেষক ভবতোষ দত্তের মতে – 'বহিরঙ্গ অনুসরণের কথা ছেড়ে দিলেও নারীত্বের প্রতি শ্রদ্ধা বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সমান। কমলাকান্ত বলেছিল, 'মাতার আদর, স্ত্রীর প্রেম, কন্যার ভক্তি। ইহার অপেক্ষা জীবনের সন্তাপে আর কি সুখের আছে? পঞ্চভূতের 'নরনারী' লেখাটিতে বাঙালি নারীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর শ্রদ্ধার নিদর্শন আছে। সেই প্রসঙ্গেই বঙ্কিমের উপন্যাসের কুন্দনন্দিনী, সূর্যমুখী, ভ্রমর, রোহিনী, কপালকুণ্ডলা চরিত্রগুলির সজীবতা পুরুষ চরিত্রগুলির তুলনায় কত বেশি, সেকথা বলেছেন। সেই সঙ্গে দেখিয়েছেন আর এক শ্রেণীর নারী চরিত্র সেগুলি প্রচণ্ড ক্রিয়াশীলা, যেমন দুর্গেশনন্দিনীর বিমলা, আনন্দমঠের শান্তি, দেবী চৌধুরাণী।

যে ধর্মের ব্যাখ্যা নিয়ে দুই সাহিত্যরথীর মধ্যে মানসিক দূরত্ব গড়ে উঠেছিল, যে কৃষ্ণ বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা-চৈতন্যে আদর্শ পুরুষ, সেই 'কৃষ্ণচরিত্রে'র লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ বিশ্লেষণ – ''আমাদের বঙ্গসমাজের এইরূপ উল্টারথের দিনে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' রচিত হয়। যখন বড়ো ছোটো অনেকে মিলিয়া জনতার স্বরে স্বরে মিলাইয়া গোলে হরিবোল দিতেছিলেন তখন প্রতিভার কণ্ঠে একটা নূতন সুর বাজিয়া উঠিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' গোলে হরিবোল নহে। ইহাতে সর্বসাধারণের সমর্থন নাই। সর্বসাধারণের প্রতি অনুশাসন আছে। . . . বঙ্কিম প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি ঐতিহাসিক বিচার প্রয়োগ করিয়া তাহার সার এবং অসার ভাগ পৃথককরণ, তাহার প্রামাণ্য এবং অপ্রামাণ্য অংশের বিশ্লেষণ এমন নিঃসংকোচে করিয়াছেন যে এখনকার দিনে তাহার তুলনা পাওয়া কঠিন।" (আধুনিক সাহিত্য)

কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বঙ্কিম-আবেগ, বঙ্কিমের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা কি করে বিরাগে পরিণত হল তা ভাববার বিষয়।

যে চারটি প্রবন্ধ বিতর্ক বিরোধের কারণ সেগুলির প্রকাশ ১২৯১ বঙ্গাব্দে। প্রবন্ধগুলির প্রকাশকাল এইরকম – দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্মের অন্তর্গত 'হিন্দুধর্ম্ম' (প্রচার, শ্রাবণ ১২৯১); 'একটি পুরাতন কথা' (ভারতী, অগ্রহায়ণ ১২৯১); 'ব্রাহ্মসমাজ ও নব হিন্দু সম্প্রদায় (প্রচার, অগ্রহায়ণ ১২৯১) এবং 'কৈফিয়ৎ' (ভারতী, পৌষ ১২৯১)।

'প্রচার' ও 'নবজীবন' পত্রিকায় যখন ধারাবাহিকভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মবিষয়ক লেখাগুলি প্রকাশ পেতে লাগল তখনই বিতর্কের সৃষ্টি হল। ঐ বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের 'একটি পুরাতন কথা' প্রবন্ধের সূত্রে। প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন – ''আমাদের দেশের প্রধান

লেখক প্রকাশ্যভাবে অসঙ্কোচে নির্ভয়ে অসত্যকে সত্যের সঙ্গে একাসনে বসাইয়াছেন, সত্যের পূর্ণ সততা অস্বীকার করিয়াছেন এবং দেশের সমস্ত পাঠক নীরবে নিস্তব্ধভাবে শ্রবণ করিয়া গিয়াছেন।..."

লেখক মহাশয় একটি হিন্দুর আদর্শ কল্পনা করিয়া বলিয়াছেন, তিনি 'যদি মিথ্যা কহেন তবে মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্তি স্মরণপূর্বক যেখানে লেখক হিতার্থে মিথ্যা নিতান্তই প্রয়োজনীয়, অর্থাৎ সেখানে মিথ্যাই সত্য হয়, সেইখানেই মিথ্যা কথা কহিয়া থাকেন।' কোন খানেই মিথ্যা সত্য হয় না, শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিমবাবু বলিলেও হয় না, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিলেও হয় না।"

'ভারতী'তে লেখা রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্রের দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত 'হিন্দুধর্ম্ম' প্রবন্ধের প্রত্যুত্তর। হিন্দুর মনের সুলুক সন্ধানে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন কেউ – 'যদি মিথ্যা কথা কহেন, তবে মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্তিস্মরণপূর্বক যেখানে লোকহিতার্থে মিথ্যা প্রয়োজনীয় অর্থাৎ মিথ্যাই যেখানে সত্য হয়, সেইখানেই মিথ্যা কথা কহিয়া থাকেন।'

বঙ্কিমচন্দ্র নাস্তিক ছিলেন না, তিনি ধর্মালোচনার খোলস থেকে মানুষের চরিত্রের আসল রূপটুকু তুলে এনে তাঁর ব্যক্তিগত অনুভবের কথাই প্রবন্ধে লিখেছেন। বঙ্কিম-রবীন্দ্রের বিরোধ সাহিত্য সৃষ্টি নিয়ে নয় বা সৃষ্ট সাহিত্যের মৌলিকত্ব নিয়েও নয়। ধর্মের প্রতিপালন মুখ্য বিষয় নয়, বিরোধের মূলে সত্য-মিথ্যার অন্তর্নিহিত অর্থ কি তা নিয়ে। ধর্ম সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা হয়তো এরকমই ছিল যে মানুষও সমাজের সার্বিক উন্নতি অর্থাৎ মানুষের হিতসাধনই ধর্মের সারকথা। তিনি 'কৃষ্ণচরিত্রে'র কৃষ্ণকে অবতাররূপে কল্পনা করেননি। তিনি কৃষ্ণকে মানবচরিত্র দিয়েছিলেন। কৃষ্ণোক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নয়, মানুষ প্রয়োজন সাপেক্ষে সত্য মিথ্যার আশ্রয় নেয়। সাধারণ মানুষ সত্য-মিথ্যার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার প্রতি ঔৎসুক্য প্রকাশ করে না। আত্মস্বার্থে সত্যের স্থলে মিথ্যার আশ্রয় সাধারণ মানুষের ধর্ম।

'একটি পুরাতন কথা'-র উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন – 'আদি ব্রাহ্মসমাজ ও নব হিন্দু ধর্ম' (প্রচার, অগ্রহায়ণ ১২৯১), তাঁর মনে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ঐ প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মসমাজের মনের কথা, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের বিষয়টি প্রকাশ করেছেন। তাঁর কথায় "... এই রবির পিছনে একটা বড় ছায়া দেখিতেছি।"

পরে 'জীবনস্মৃতি'তে কবি লিখেছিলেন – 'বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে আমার একটা বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল। তখনকার 'ভারতী' ও 'প্রচারে' তাহার ইতিহাস আছে।'

ইতিহাসটি এইরকম – বঙ্কিমচন্দ্র যখন 'হিন্দুধর্ম্ম' প্রবন্ধটি লেখেন (১২৯১ সালের শ্রাবণ মাসে) তখন রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক। তিনি সম্ভবত কার্তিক মাসের কোনও এক তারিখে আদি ব্রাহ্মসমাজ হলে একটি প্রতিবাদী প্রবন্ধ পাঠ করেন (একটি পুরাতন প্রথা)। প্রবন্ধটি 'ভারতী'তে প্রকাশের আগেই রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার কথা চলে গেল বঙ্কিমের কানে, অবশ্যই রঙ চড়িয়ে। তাই রবীন্দ্রনাথের 'মুখ্য' লেখক, তিনি শুনেছেন 'মূর্খ' লেখক। তিনি উত্তেজিত হয়েছেন। কেননা রবি লিখেছিলেন, 'কোনখানেই মিথ্যা সত্য হয় না, শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিমবাবু বলিলেও হয় না, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিলেও হয় না।'

'আদি ব্রাহ্মসমাজ ও হিন্দু সম্প্রদায়' শীর্ষক প্রবন্ধে (প্রচার, অগ্রহায়ণ) বঙ্কিম লিখেছিলেন ''সর্বনাশের কথা বটে, আদি ব্রাহ্মসমাজ না থাকিলে আমার হাত হইতে দেশ রক্ষা পাইত কিনা সন্দেহ। হয়ত পাঠক জানিতে ইচ্ছা করিতেছেন, কবে এই ভয়ংকর ব্যাপার ঘটিল। কবে আমি পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া স্পর্ধা সহকারে লোক ডাকিয়া বলিয়াছি, তোমরা ছাই ভস্ম সত্য ভাসাইয়া দাও, মিথ্যার আরাধনা কর। কথাটার উত্তর দিতে পারিলাম না। ভরসা ছিল, রবীন্দ্রবাবু এই বিষয়ে সহায়তা করিবেন, কিন্তু তাহা করেন নাই।'

কিংবা,

''আমি বলিলেও মিথ্যা সত্য না হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ বলিলেও না হইতে পারে। কিন্তু বোধ করি আদি ব্রাহ্মসমাজের কেহ কেহ বলিলে হয়।''

অথবা,

''আদি ব্রাহ্মসমাজের লেখকদিগের কাছে আমার একটা নিবেদন আছে। আদি ব্রাহ্মসমাজকে আমি বিশেষ ভক্তি করি। আদি ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা এদেশে ধর্ম সম্বন্ধে বিশেষ উন্নতি হইয়াছে ও হইতেছে জানি। বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাবু রজনীকান্ত বসু, বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যে সমাজের নেতা, সে সমাজের কাছে অনেক শিক্ষা লাভ করিব, এমন আশা রাখি। কিন্তু বিবাদ বিসম্বাদে সে শিক্ষালাভ করিতে পারিব না।''

বিবাদ-বিসম্বাদ অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হল না। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'কৈফিয়ৎ' প্রবন্ধ তা প্রকাশিত হয়েছিল 'ভারতী' পত্রিকায় ৮ম বর্ষ ৯ম সংখ্যায় (পৌষ ১২৯১)। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন – ''বঙ্কিমবাবু তাঁহার প্রবন্ধে যেখানেই অবসর পাইয়াছেন আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রতি সুকঠোর সংক্ষিপ্ত ও তির্যক কটাক্ষপাত করিয়াছেন। সেরূপ কটাক্ষপাতে আমি ক্ষুদ্র প্রাণী যতটা ভীত ও আহত হইব আদি ব্রাহ্মসমাজের অতটা হইবার সম্ভাবনা নাই। আদি ব্রাহ্মসমাজের নিকটে বঙ্কিমবাবু নিতান্তই তরুণ। বোধ করি বঙ্কিমবাবু যখন জীবন আরম্ভ করেন নাই তখন হইতে আদি ব্রাহ্মসমাজ নানাদিক হইতে আক্রমণ সহ্য করিয়া আসিতেছেন কিন্তু কখনোই তাঁহার ধৈর্য বিচলিত হয় নাই।''

আবার জানিয়েছিলেন – ''আমি যে লেখা লিখিয়াছি তাহা সমস্ত বঙ্গসমাজের হইয়া লিখিয়াছি বিশেষরূপে আদি ব্রাহ্মসমাজের হইয়া লিখি নাই।''

বঙ্কিমচন্দ্র তো কৈফিয়ৎ চাননি। বোঝা গেল না বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার উল্লেখ করে তেইশ বছরের রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভুল স্বীকার করলেন নাকি নিশ্চিন্ত হলেন সাহিত্যসম্রাটকে স্থানচ্যুত করে। অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত 'জীবনস্মৃতি' থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন –

''. . . এই বিরোধের অবসানে বঙ্কিমবাবু যে একখানি পত্র লিখিয়াছেন আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হারাইয়া গিয়াছে, যদি থাকিত তবে পাঠকরা দেখিতে পাইতেন, বঙ্কিমবাবু কেমন সম্পূর্ণ ক্ষমার সহিত এই বিরোধের কাঁটাটুকু উৎপাটন করিয়া ফেলিয়াছেন।''

(বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ, দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৯৫)

বিস্মিত হতে হয় যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্যক্তিগত চিঠিপত্র অতি যত্নে সংরক্ষণ করতেন,

যেগুলি শুধু তাঁর অন্তর্জগতের সন্ধানই দেয় না, যা হয়ে উঠেছিল বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ, রবীন্দ্রনাথকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের সেই মূল্যবান চিঠির বিষয়বস্তু আমাদের জানা হল না।

২৬ চৈত্র, ১৩০০ (১৮৯৪ এপ্রিল ৮) সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র প্রয়াত হলেন। ১৬ বৈশাখ ১৩০১ (২৮ এপ্রিল, ১৮৯৪) কলকাতার স্টার থিয়েটারে চৈতন্য লাইব্রেরি ও বিডন স্কোয়ার লিটারারি ক্লাবের উদ্যোগে বঙ্কিমচন্দ্রের মহতী স্মরণসভার আয়োজন করা হয়েছিল। সভাপতি স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যতম বক্তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এক ঘণ্টা পেরিয়ে গিয়েছিল শোক-প্রবন্ধটি পাঠ করতে রবীন্দ্রনাথের। প্রবন্ধটি ১৩০১ বৈশাখের 'সাধনা' পত্রিকায় 'বঙ্কিমচন্দ্র' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ''বঙ্কিমের প্রতিভা যদি আমাদের পথ খনন করিয়া না দিত তবে আমরা এতদিনে শিশু পাঠ্য গ্রন্থের প্রথমভাগ দ্বিতীয় ভাগ তৃতীয় ভাগ শেষ করিয়া বড়জোর চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ ভাগে উপনীত হইতাম। কিন্তু বঙ্গসাহিত্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইত না। আজ আমাদের কোনো লেখা যদি বয়স্ক লোকের পাঠযোগ্য, শিক্ষিত লোকের সমাদরযোগ্য, বিদেশী ভাষায় অনুবাদযোগ্য হইয়া থাকে, কোনো রচনার একটি অংশও যদি সর্বদেশ ও সর্বখানে স্থায়ী হইবার উপযোগী সুসম্পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়া থাকে, তাহা অনেকটা পরিমাণে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রসাদে।"

বঙ্কিম-জন্ম-শতবর্ষ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ স্বরচিত একটি কবিতায় (বঙ্কিমচন্দ্র) বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশস্তি-কীর্তন করেন (কবিতাটি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বঙ্কিম শত বার্ষিকী উৎসবে পঠিত হয় (১০ আষাঢ়, ১৩৪৫)। কবিতাটি ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি' এবং শ্রাবণ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়। কবিতাটি স্মরণযোগ্য ঃ

বঙ্কিমচন্দ্র

''যাত্রীর মশাল চাই রাত্রির তিমির হানিবারে, / সুপ্তিশয্যা পার্শ্বে দীপ বাতাসে নিভিছে বারে বারে। / কালের নির্মম বেগ স্থবির কীর্তির চলে নাশি, / নিশ্চলের আবর্জনা নিশ্চিহ্ন কোথায় যায় ভাসি। / যাহার শক্তিতে আছে অনাগত যুগের পাথেয় / সৃষ্টির যাত্রায় সেই দিতে পারে আপনার দেয়। / তাই স্বদেশের তরে তারি লাগি উঠিছে প্রার্থনা / ভাগ্যের যা মুষ্টিভিক্ষা নহে, নহে জীর্ণ শস্যকণা / অঙ্কুর ওঠে না যার, দিনান্তের অবজ্ঞার দান / আরম্ভেই যার অবসান /

সে প্রার্থনা পূরায়েছ, হে বঙ্কিম, কালের যে বর / এনেছ আপন হাতে নহে তাহা নির্জীব স্থাবর। / নবযুগ সাহিত্যের উৎস উঠি মন্ত্রস্পর্শে তব / চির চলমান স্রোতে জাগাইয়াছে প্রাণ অভিনব / এ বঙ্গের চিত্তক্ষেত্রে, চলিতেছে সম্মুখের টানে / নিত্য নব প্রত্যাশায় ফলবান ভবিষ্যৎপানে। তাই ধ্বনিতেছে আজি সে বাণীর তরঙ্গ কল্লোলে, / বঙ্কিম তোমার নাম, তব কীর্তি সেই স্রোতে দোলে। / বঙ্গভারতীর সাথে মিলায়ে তোমার আয়ু গণি, / তাই তব করি জয়ধ্বনি।।"

ঋণস্বীকার ঃ–

(১) দেশ সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৯৫

(২) পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা, রবীন্দ্র স্মরণ সংখ্যা, ১৪০৬

(৩) কোরক পত্রিকা, বইমেলা সংখ্যা (বঙ্কিম স্মরণ সংখ্যা), ১৪১৯

কেন বঙ্কিম?

বিপ্রদাস ভট্টাচার্য

নিজের সত্য পরিচয় পাওয়া সহজ নয়। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিতরের মূল ঐক্যসূত্রটি ধরা পড়তে চায় না। বঙ্কিম রচনাবলী সমগ্ররূপে যখন দেখা যায় তাঁর একটি মাত্র পরিচয় স্পষ্ট হয় তখন। তিনি আর কিছুই নন, তিনি মানুষের, সকলের উন্নতির পথ মুক্ত হোক তার জন্যে অক্লান্ত ও বিস্তর তর্ক করেছেন। তিনি গুরু বা নেতা নন, নববঙ্গে নবযুগের চালকও নন। সমাজ গঠনের কথাও বলেন না – গঠনের সামগ্রীর কথা বলেন। যেখানে বুদ্ধি, মানসিক শক্তি, শিক্ষা, বল প্রভৃতির স্বাভাবিক তারতম্য আছে, সেখানে অবশ্যই অবস্থার তারতম্য ঘটবে – কেউ রক্ষা করতে পারবে না। তবে অধিকারের সাম্য থাকবে না কেন? এই বড় প্রশ্নবোধক চিহ্নের সামনে আমাদের তিনি দাঁড় করিয়ে দেন।

অসহায় মানুষের দুঃখ, দুর্দশা ও যন্ত্রণাকে অন্তরে গ্রহণ করে মগজের আতসকাচে ফেলে তাকে যাচাই করা তাঁর কাজ। মানবকে তার যথার্থ গন্তব্যে চালাবার দাবি রাখেনি নি, তিনি মুখে রঙ মাখা শব্দ অনর্গল ব্যবহার করে তামাশা করেন নি, কোনো নশ্বর সারশূন্য বাহাদুরির জন্য সময় ব্যয় করেন নি। মূর্খের করতালিতে যারা মুগ্ধ হয় তারা অগ্রসর হবে কী করে? যারা আজন্ম মূর্খ হয়ে থাকতে চায় তাদের জীবনের অন্ধকারের সঙ্গে আলোর প্রথম শুভদৃষ্টি কি কোনদিন সম্ভব?

বঙ্কিমচন্দ্র পৃথিবীর সেই পরিব্রাজক যিনি বিলক্ষণ জানতেন সমাজে অসংখ্য মানুষের বসবাস থাকলেও তা আনন্দের ভুবন হবে তা কিন্তু নয়, তা নরকও হতে পারে মূলতঃ বৈষম্যের কারণে। যেমন সৌরবিজ্ঞানীরা বলেন, 'a habitable zone does not guarantee that it will be a hospitable place.' সব কিছুকে Desiccation করা তাঁর স্বভাব। কেননা তিনি

জানতেন অজ্ঞানতা, বিমূঢ়তা বা অতিমুগ্ধতা মানুষকে বিচার বিমুখ করে। আর প্রবল প্রতাপান্বিত যাঁরা, তাঁরা মানুষকে কদাচিৎ নির্মল নিরাময় কল্যাণব্রতে প্রবর্তিত করেছেন। তাঁদের মানসিক সীমাবদ্ধতার প্রতিবাদে তিনি প্রবৃত্ত ছিলেন। একমাত্র সত্যসন্ধানেই তাঁর ছিল অটুট বিশ্বাস। বালক-মনোরঞ্জনের যোগ্য উপন্যাস রচনায় তিনি ছিলেন অনিচ্ছুক। যে জাতির পূর্ব্বজন্মার্জিত পুণ্যে অনন্ত বিশ্বাস, শ্রীহরির শ্রীচরণমাত্রভরসা তারা বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কারের বিরোধিতা করবে, ভণ্ড শাস্ত্রজ্ঞদের লোকহিতৈষী বলবে তাতে তিনি বিন্দুমাত্র বিস্মিত হতেন না। কিন্তু যিনি কদাচার করেন, নিষ্প্রয়োজনে কপটতা করেন, তিনি তাঁর কাছে অধিকতর নিন্দনীয়।

তাঁর লেখার মধ্যে আছে শিক্ষার অসামান্য প্রয়োজনের কথা। ইন্দ্রিয় সংযমের কথা। শিক্ষা আমাদের চিন্তার গণ্ডী প্রসারিত করে এবং নানা কাজে আমাদের ক্ষমতাও বাড়ায়। শিক্ষার সঙ্গে সক্ষমতার যোগ তাই অঙ্গাঙ্গিক। দর্শন ও সমাজচিন্তার অবহেলা মানুষকে ক্ষুদ্র করে। কেবল মন নয় শরীরকেও অপুষ্ট করে। সমাজের যে অবস্থা মানুষের অনুকূল, তাকে তিনি স্বাধীনতা বলেন। মনুষ্য মাত্রের পক্ষেই স্বাধীনতা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

দেওয়াল শূন্য আবহাওয়ায় ক্লাস করার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অবাধ স্বাধীনতার প্রয়োজনের প্রতি ইঙ্গিত আছে। ক্লাসের বাইরেও, সিলেবাসের বাইরে যে ঘটনা ঘটছে তা দেখেও আমাদের পাঠে মনোনিবেশ করার মধ্যে যে অধ্যবসায় আছে তাও ভবিষ্যৎ জীবনে সক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। জীবনের সঙ্গে শিক্ষার বহুমুখী যোগের দিকে রবীন্দ্রনাথ জোর দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য – যারা মাটির কোলের কাছে আছে, যারা মাটির হাতে মানুষ, যারা মাটিতেই হাঁটতে আরম্ভ করে, শেষকালে মাটিতেই বিশ্রাম করে, আমি তাদের সকলের বন্ধু, আমি কবি।

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ আজীবন আত্মসন্ধান বা অন্তরদৃষ্টি চর্চার জন্য তাঁদের নিজেদের সত্য পরিচয় রেখে গেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বরাবর নিজের দৃষ্টিভঙ্গিকে বিজ্ঞানের সাথে, বিচার বোধের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। আবেগ ও বেগের যে আপাত-সংঘাত, তা নির্মূল করার পথনির্দেশ আমাদের দেখিয়ে গেছেন। তাঁর মতে অসঙ্গত কথা না বলাই শ্রেয়। অসম্পূর্ণতা শক্তির অভাবের ফল। মুঘল বা ইংরেজদের লেখা ইতিহাস আমরা পড়ি। সেখানে আমাদের স্বদেশীয়দের সক্ষমতার পূর্ণ রূপের পরিচয় পাই না। আমাদের সাফল্যের খতিয়ানও থাকে না। তাই এক হীনমন্যতায় আমরা ভুগি। বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থ ভারতীয় ইতিহাসের প্রয়োজনের কথা বার বার বলেছেন। আমাদের সমাজচিন্তার মধ্যে অসম্পূর্ণতার বড় রকমের সম্ভাবনা আছে বলেই তিনি মনে করতেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও মধুসূদন দত্ত তাঁদের শিক্ষার মুক্তধারার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন মহাকাব্যের ও বেদবেদাঙ্গ জ্ঞান সম্পদের ধারাকে। মানুষী শক্তির দ্বারা কর্ম করতে গেলে, প্রকৃত শিক্ষা এবং মননচর্চার দ্বারা সেই মানুষী শক্তিকে অনুশীলিত এবং স্ফুরিত করতে হয়। ইংরেজি শিক্ষার গুণে যথার্থ লোককল্যাণ হয়নি। তার মূল কারণ সম্পদাকাঙ্ক্ষা। এই নেশা সমাজের ঘোরতর অনিষ্টের কারণ। সমাজের উন্নতির গতি যে তত মন্দ তার আরও একটি

প্রধান কারণ যে মহাপুরুষেরা আমাদের শেখালেন, ঐহিক ব্যাপারে চিত্তনিবেশ মাত্র অনিষ্টপ্রদ, মানুষ সর্বত্যাগী হয়ে নির্ব্বাণাকাঙ্ক্ষী হোক। ভারতে এই শিক্ষার ফল বিষময় হয়েছে। বাহুবলহীন বাঙালী। শিক্ষিত অশিক্ষিতের সঙ্গে মিশতে পারে না। সমবেদনা নেই ওদের মধ্যে। তাই ভারতে এত দুর্দশা।

তাঁর লেখার প্রধান গুণগুলি হল তিনি প্রশংসার ছলে অনায়াসে তীব্র নিন্দা করতে পারেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় তিনি সবিনয়ে খুব সরল কথা বলছেন। আসলে তা একটি বিষাক্ত হুল। তাঁর বক্তব্য সংক্ষিপ্ত, সুনির্দিষ্টি, অনুরণনশীল ও বহুস্তরিক। সমস্ত প্রকার অন্যায় অবিচারের সামনে অক্লান্ত যোদ্ধা। খুব সাহসী ও স্পষ্ট বক্তা। কলম তাঁর কাছে কৃপাণের মতন। পাপপূর্ণ মৌচাকে ঢিল মারা তাঁর স্বভাব। সমাজের কদর্য বৈষম্য তাঁকে পীড়া দেয়। আর আমরা অনেকেই দু'চোখ মেলেও চিরকাল জন্মান্ধ থেকে গেছি। নিজের স্বাধীন চোখে জগতকে দেখার স্বাদই আলাদা। বঙ্কিমচন্দ্রের বিড়াল-কে স্মরণ করা যাক। তার সরাসরি প্রশ্ন – "পাঁচশত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া একজনে পাঁচশত লোকের আহার্য্য সংগ্রহ করিবে কেন? ... অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আসে নাই।" সে জানে, সামাজিক ধনবৃদ্ধি ব্যতীত সমাজের কোনো উন্নতি নেই। "চোরকে ফাঁসি দাও, তাহাতেও আমার আপত্তি নাই, কিন্তু তাহার সঙ্গে আর একটি নিয়ম কর। যে বিচারক চোরকে সাজা দিবেন, তিনি আগে তিন দিবস উপবাস করিবেন। তাহাতে যদি তাঁহার চুরি করিয়া খাইতে ইচ্ছা না করে, তবে তিনি স্বচ্ছন্দে চোরকে ফাঁসি দিবেন।"

এ এক আপোষহীন বঙ্কিমচন্দ্র। ন্যুব্জ নন ক্ষমতার কাছে। তাঁর সাহস সত্যিই চমৎকার। ধর্ম তাঁকে কখনোই সম্মোহিত করে নি। তিনি যোদ্ধা। আলোর ভগীরথ। Paulo Coelho-র ভাষায় বলা যায় – A warrior of light. He knew the power of words. He never accepted what was unacceptable. He had the power to observe and learn'. He gave us a better understanding of our social ills and weighed the social issues more carefully. He revealed the evils of life. He shoke his thought, with human and caustic witticism, lampooning human behaviour, dogged adherence to hollow beliefs.

বোধহয় তাই বঙ্কিমচন্দ্র সর্বত্র গর্দভকে দেখেছেন। বিশ্বব্যাপী তাঁর পূজো চলছে। তাঁর অনবদ্য ভাষায় – "তুমি বহুকাল হইতে পৃথিবী তলে বিচরণ করিতেছ। তুমিই রামায়ণে রাজা দশরথ, নহিলে রাম বনে যাইবে কেন? তুমি মহাভারতে পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির, নহিলে পাণ্ডব পাশায় স্ত্রী হারাইবে কেন? তুমি কলিযুগে বঙ্গদেশে বৃদ্ধ সেন রাজা ছিলে, – নহিলে বঙ্গদেশে মুসলমান কেন? ... বিধাতা তোমায় তেজ দেন নাই, এ জন্য তুমি শান্ত, বেগ দেন নাই, এজন্য সুধীর। বুদ্ধি দেন নাই, এজন্য তুমি বিদ্বান ... এবং মোট না বহিলে খাইতে পাওনা, এজন্য তুমি পরোপকারী আমি তোমার যশগান করিতেছি – ঘাস খাইয়া সুখী কর।"

এখানে তাঁর নীরব অক্ষর, কলমের কালি জ্যোৎস্নার মতন সুশীতল নয়। তাঁর অক্ষরমালা যেন আগুনের পোযাক পরা। তাঁর কথাগুলো বারুদের মতন চেতনার উপর এসে পড়ে।

আমাদের তিন নম্বর চোখ খুলে যায়। ভীতু ভীতু শান্তিপ্রিয় কথায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। তার যুক্তি প্রাখর্যে মগজ পুষ্ট হয়। পাঠে সুখ পাই। আনন্দে ভরে উঠে মন। আমরা অর্বাচীনের পূজো করি, ইহলোক বা পরলোকে সুখের আশায়। আর একটি পতিত আত্মাকে অন্ধকার থেকে আলোয় এনে কমলাকান্তের বড় আনন্দ হয়। আপোষহীন বঙ্কিমের আত্মপরিচয় বোধ হয় এখানেই। দার্শনিক Descartes বলেছিলেন, I think therefore I am. পদার্থবিদ Von Neuman-এর কথা – Observation is the action of a conscious mind. বঙ্কিম রচনার spirit হল – I challange therefore I am. The challenge is how to encourage altruistic behaviour among the affluent. তাঁর দৃপ্ত কলম সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের সর্বাঙ্গীণ সম্পূর্ণতা প্রাপ্তির সম্ভাবনার কথা বলার চেষ্টা করেছে।

ধর্মতত্ত্ব আলোচনা করার সময় বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরমুখী বৃত্তিগুলি নিয়ে গভীর আলোকপাত করেছেন। অনন্ত মঙ্গল, অনন্ত শক্তি, অনন্তই যে বৃত্তির উদ্দেশ্য তার অবরোধ আবার কোথায়? জীবন সার্থক হয় যদি এই সত্যকে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। সুফি প্রার্থনা এখানে মনে আসছে – 'O God, When I listen to the voices of animals, the sounds of trees, the murmurings of water, the singing of birds, the whistling of the wind or the boom of thunder, I see in them evidence of your unity'।

প্রাণের এই মূল ঐক্য সূত্রটি মানুষকে ঈশ্বরগামী করে। আমাদের অধ্যাত্ম সন্ধান আত্ম-আবিষ্কারের যাত্রাপথ ছাড়া আর কিছু নয়। এই ঐক্য ও একতাই আমাদের সাহায্য করে উন্নততর মানুষ হতে।

মহাকাশ বিজ্ঞানীরা যেমন টেলিস্কোপ দিয়ে রাতের আকাশ দেখেন ঠিক তেমনি খালি চোখ দিয়েও তাঁরা অনেক কিছু দেখতে এবং বুঝতে পারেন। খালি চোখে আমরা ৫,০০০-এর কম তারা দেখতে পাই। সব তারা এক আকারের নয়। সবার রঙও এক নয়। কেউ সাদা, কেউবা নীলাভ সাদা, কেউ সবুজ, লাল বা কমলা রঙের। রঙের এই বৈচিত্র তারতম্য শুধু temperature-এর কারণে। প্রবন্ধকার বঙ্কিমচন্দ্র খালি চোখে মানব ও মানবসমাজকে দেখে যে বিশ্লেষণ করেছেন তা আমাদের অনেকেরই নজর এড়িয়ে যায়। তাই তাঁর মেধা এবং বিচারবুদ্ধি আমাদের জীবনবোধে সহায়। মানুষের হিতকামনা তাঁর সাহিত্যচর্চার মূল উদ্দেশ্য ছিল। যে মানুষের ভাল মন্দের বিচার নেই, সৌন্দর্য্যে আন্তরিক অনুরাগ নেই অথচ ধনাঢ্য বলেই মহার্ঘ্য বস্তু সংগ্রহে শুধু আগ্রহী, তাঁর মতে অশিক্ষিতের সমান।

বাংলা সাহিত্যে সার্থক ও পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস রচনার পথপ্রবর্তক (He was not just an interpreter of life but a beacon of light) তিনি। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলি বঙ্কিমের তুলনায় বোধহয় নিষ্প্রভ। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের চরিত্রগুলি রক্তমাংসের জীবন্ত মানুষ বলে বোধহয়। তুলনায় রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের চরিত্রগুলি more an idea than an individual. বঙ্কিমের সাহিত্য কখনই শৌখিন মজদুরি বলে মনে হয় না। তাই তাঁর ভাবনা রচনা নাকচ করে দেওয়া সহজ নয়। তাঁর লেখা অনিপুণ নয় শুধুমাত্র বোধ হয় এই কারণে যে

সেগুলি প্রায় অখণ্ডনীয় যুক্তিতে পরিপূর্ণ। সমাজের ভণ্ডামি ও কপটতার মুখোশ তিনি খুলে দিয়েছেন।

তিনি সর্বদা যে বিষয়ে সতর্ক ছিলেন তা হল তাঁর কলমের মুখে তিনি কখনো মিথ্যা বসান নি। কখনও কোনো কাজ ফেলে রাখতেন না। বিনা পরিশ্রমে উন্নতি হয় না – এ সত্য বিলক্ষণ জানতেন। পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের অধীন আমরা। আত্মসুখে ব্যস্ত। তবু অপরের হিতকামনায় তাঁর কলম সদা জাগ্রত ছিল। শক্তি ও সৌন্দর্যের বিকাশ লোকহিতার্থে প্রয়োজন, তাঁর মতে। তাই তিনি আজও আমাদের জীবনে প্রবল ভাবে প্রাসঙ্গিক। বঙ্কিম কেন? মানবতন্ত্রের উন্নতির জন্য? বুদ্ধিবল যথেষ্ট করায়ত্ত্ব করার জন্য? বঙ্কিমের ভাষা স্পষ্টতই কিছুটা কঠোর পাচ্য – কিন্তু তার ভাবনা পুষ্টিকর সন্দেহ নেই। জোর করে সবাইকে তিনি কিছু তথ্য বা তত্ত্ব গিলিয়ে দিতে চান নি। তার লেখায় লক্ষ্য করা যায় জীবন ও অভিজ্ঞতার মিলনমেলা। শুভ চেতনার আলোয় আলোকিত।

মনে পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র ও শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎকারের কথা অধরবাবুর বাড়ীতে। কথা প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বঙ্কিমকে প্রশ্ন করেন, মানুষের কর্তব্য কী? বঙ্কিমচন্দ্র জবাবে বলেন – আহার নিদ্রা ও মৈথুন। রামকৃষ্ণদেব একথা শুনে গভীর দুঃখ পান। একজন জ্ঞানী, পণ্ডিতের কাছে এরকম উত্তর তিনি আশা করেন নি। তাই তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন – শকুন যতই উপরে উঠুক তার মন, চোখ ভাগাড়ের দিকে থাকে। যে মূলো খায় তার মূলোরই ঢেকুর ওঠে। পণ্ডিতেরা তাই ঈশ্বরকোটির মানুষ নন। এবিষয়ে মনে নানা প্রশ্ন জাগে। উর্বর মস্তিষ্কের মানুষ কী তবে মহাত্মা নন? আহার, নিদ্রা ও মৈথুন তো basic instinct. একথা অগ্রাহ্য করি কি করে? শুধু বেঁচে থাকার জন্যেই তো মানুষ প্রভূত পরিশ্রম করে। মিথ্যে কথা বলে। অপরকে ঠকায় এমনকি অপূরণীয় ক্ষতিও করে? কথাগুলো কি মিথ্যে? আধ্যাত্ম জগতে প্রবেশের জন্য এসবের কোনো প্রয়োজন নেই। ঈশ্বরলাভের জন্য সব কিছু ত্যাগ করা আমার পক্ষে সম্ভব? তবে দুজনেই কী সত্য দুজনের পৃথক, দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য? উভয়েই সত্য নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে? সবই সত্য কেউ মিথ্যে নয়? নিজের শক্তির উপর যে দাঁড়াতে পারে সেই মানুষ। এটা বঙ্কিমের মত। আর শ্রীরামকৃষ্ণের মত হল – মান সম্পর্কে যাঁর হুঁশ আছে সেই মানুষ। চৈতন্যহীন মানুষের জীবন নিষ্ফল। মানুষ যখন তার উচ্চতা, গভীরতা ও ব্যপ্তি সম্পর্কে সচেতন হয়, মঙ্গলকর্মে নিযুক্ত হয় তখন সে তার প্রকৃত পরিচয়ের সন্ধান পায়। দুজনেই বিশ্বাস করতেন – মনুষ্যজীবন আনন্দময়। এই পৃথিবী একটি সুন্দর বাসযোগ্য স্থান হবে সবার জন্যে যেদিন অন্যায়-অবিচার কথাগুলির অর্থ শুধু অভিধানে লেখা থাকবে। মানুষের জীবনে দেখা যাবে না।

সম্রাট ও দার্শনিক

ডঃ নলিনীরঞ্জন কয়াল

সাহিত্য-সম্রাট ও বিজ্ঞানী-দার্শনিক। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। দুইজনের আবির্ভাব-এর ব্যবধান ষষ্ঠবিংশতি বর্ষ। বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব ১৮৩৮ খ্রিঃ, রামেন্দ্রসুন্দরের ১৮৬৪ খ্রিঃ।

দুইজনেই বাঙালি। দুইজনেই বঙ্গের উজ্জ্বল দুই জ্যোতিষ্ক। বঙ্কিমচন্দ্র যে-অর্থে বাঙালি, সেই অর্থে রামেন্দ্রসুন্দর নহেন, যেমন সখারাম গনেশ দেউস্কর বাঙালি ছিলেন না। অথচ রামেন্দ্রসুন্দর বঙ্গভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন। রামেন্দ্রসুন্দরের পূর্বপুরুষেরা বঙ্গ সমাজ-সংস্কৃতির মূল প্রবাহের সহিত মিশিয়া গিয়াছেন এবং রামেন্দ্রসুন্দর সেই অর্থে বাঙালি।

বঙ্কিমচন্দ্র ও রামেন্দ্রসুন্দর উভয়েই বঙ্গভাষায় সাহিত্য রচনা করিয়া অমরত্বলাভ করিয়াছেন। উভয়ের রচনাবলী বাঙালির চিন্তা ও মননের ভাণ্ডারে স্থায়িত্বদান করিয়াছে। বাঙালির জাতীয় মানসকে সচল তথা সমৃদ্ধ করিয়াছেন এই দুই মনীষী। এককালে পশ্চিম যে-দ্বার উন্মোচন করিয়াছিল, সেই দ্বারপথে সাহিত্যের মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া তথাকার দেব-দেবীর আশীর্বাদ লইয়া ইঁহারা বঙ্গভারতীকে সালংকারা দেবীতে পরিণত তথা বাঙালির সম্মুখে একটি নবদিগন্তের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়াছেন।

এই দুই মনীষীর রচনাতে এক বিশেষ ধরণের বৈশিষ্ট্য, তত্ত্বজিজ্ঞাসা, ইতিহাস-সন্ধিৎসা, দেশ-সাধনা ইত্যাদির পরিচয় পাওয়া যায়। সম্পূর্ণ দুই ভিন্ন কোটিতে অবস্থান করিয়া দুইজনই রসভাণ্ডার হইতে রস আহরণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যকে মাধুরী দান করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যস্রষ্টা হইয়াও যেমন ইতিহাস-ধর্ম-দর্শন ইত্যাদি রাজ্যে বিচরণ করিয়াছেন, তেমনি

রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানী হইয়াও দর্শন-সাহিত্য ইত্যাদি পরিক্রমণে বাহির হইয়াছেন। কিন্তু পরিশেষে উভয়েই মিলিত হইয়াছেন এক লক্ষ্যে, তাহা হইল 'ক্লাসিক সাহিত্য'।

বঙ্কিমচন্দ্র মনুষ্যত্বের জয়গান গাহিয়াছেন, রামেন্দ্রসুন্দর তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইয়া বিজ্ঞান ও দর্শনের আলো জ্বালাইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালির নানাবিধ সমস্যার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়াছেন, রামেন্দ্ররসুন্দর এই বৃহৎ জগদযন্ত্রে নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালির সমস্যা সমাধানে ব্যস্ত, রামেন্দ্রসুন্দরের নিকট জাগতিক অলৌকিকত্ব 'জিজ্ঞাসা'-চিহ্নিত। বঙ্কিমচন্দ্র বিজ্ঞান-ইতিহাস-ধর্ম-দর্শনাদির বনিয়াদের উপর নির্মাণ করিয়াছেন সাহিত্যের বিশাল সৌধ, জগৎ ও জীবন-সম্পর্কে ছিল তাঁহার চিরন্তন বিশ্বাস। এই বিভিন্ন বিষয়ে আনুবীক্ষণিক বিশ্লেষণের মধ্যে না গিয়া তিনি সেগুলির অভিন্নতা প্রদর্শন করিয়াছেন। অপরপক্ষে রামেন্দ্রসুন্দর বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সূত্রের আলোচনার মধ্য দিয়া একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন সত্য, তবুও তাঁহার মনের দ্বন্দ্ব, সংশয় ও দ্বিধা দূর হয় নাই। 'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে' – তাঁহার মনের নিরুদ্দেশ যাত্রা। পৃথিবীর জ্ঞানিগণের মতবাদ পাশাপাশি সাজাইয়া একান্ত জহুরীর মত জহর চিনিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিতে পারেন নাই। তাঁহার মনে চিরকালের 'জিজ্ঞাসা' রহিয়া গিয়াছে, সমাধানের সূত্র খুঁজিয়া পান নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র ও রামেন্দ্রসুন্দরের রচনাশৈলী

এই দুই সাহিত্যিকের রচনাশৈলীর মধ্যে প্রভেদ বিদ্যমান। ইঁহাদের চিন্তাধারায় বৈচিত্র্যেই রচনারীতির বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছে। একজন সাহিত্যিক, অন্যজন বিজ্ঞানী; একজনের ধ্যান বাঙালি, অন্যজনের ধ্যান বিজ্ঞান; একজন দৃঢ়প্রত্যয়ী, অন্যজন সংশয়ী; একজন বিচারক, অন্যজন অধ্যাপক।

প্রবন্ধসাহিত্যে "রচনারীতি বা স্টাইল-এ বঙ্কিমের মৌলিকতা অসাধারণ।" (বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, পৃ. ১০২, ডঃ সুকুমার সেন)। রামেন্দ্রসুন্দর মৌলিক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনার পথিকৃৎ। মৌলিকত্বের জন্যই এই দুই সাহিত্যিক বঙ্গ-সাহিত্যে বরণীয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারা রোমান্টিক আবেগে স্বতঃস্ফুর্ত্ত। নির্বাচিত বিষয়-গাম্ভীর্যে প্রীতিদায়ক। বিষয়-বিশ্লেষণের ফাঁকে ফাঁকে স্বতঃস্ফূর্ত্ত রোমান্টিক আবেগ আসিয়া রচনার বিস্তৃতি ও মাধুর্য অধিকতর বৃদ্ধি করিয়াছে। পাশ্চাত্যরীতি আত্মসাৎ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধে-বিশ্লেষণে তাহার যথার্থ প্রয়োগ করিয়া নূতন পথের দিশারী হইয়াছেন।

বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' রোমান্টিকতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের সমাজ-মনের উপযোগী মৌলিক সাহিত্য-সৃজনে বঙ্কিমচন্দ্র এক বিশেষ আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। তিনি মহাকাব্যের উত্তাল উন্মত্ত ফেনরাজির পরিবর্তে উপন্যাসের গহনগভীর হৃদয়ারণ্যে পথ অন্বেষণ করিয়াছেন; কবি শ্রীমধুসূদনের মহাকাব্য ও টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের' গদ্যের প্রতি সহানুভূতি ও করুণা প্রদর্শন করিলেও তিনি উপন্যাস-সৃজনে

আত্মনিমগ্ন হইলেন। উপন্যাসের মধ্যে তাঁহার রোমান্টিক মানস বিশেষভাবে বিকশিত হইয়াছে। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার মাধ্যমে তিনি সাহিত্য - সমালোচনা শুরু করিয়া সেখানেও রোমান্টিক পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের সুউচ্চমান নির্ধারণ করিয়াছেন।

'উত্তরচরিত'-এর 'সীতার নির্বাসন'-অংশে ক্লেশকর মর্মভেদী-সীতা-বিসর্জনে বঙ্কিমচন্দ্র ভাবাপ্লুত হইয়া পড়িয়াছেন। সহসা তাঁহার অন্তর হইতে নিঃসরিত হইল ভাবাবেগ ঃ "যে বাল্যকালে ক্রীড়ার সঙ্গিনী, কৈশোরে জীবন-সুখের প্রধান শিক্ষাদাত্রী, যৌবনে যে সংসারে সৌন্দর্যের প্রতিমা, বার্দ্ধক্যে যে জীবনাবলম্বন – ভালবাসুক বা না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারে?" (দ্রষ্টব্য ঃ 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধ) মনোহর জনস্থানে বিসর্জিতা মূর্ছিতা সীতার কর্ণরন্ধ্রে রামের কণ্ঠস্বর প্রবিষ্ট হইলে সীতার মূর্ছা ভঙ্গ হইল। সেই সময়ে তাঁহার হৃদয়াবেগ নিঃসরিত হইল ঃ "এ কি এ? জলভরা মেঘের গুনিত গম্ভীর, মহাশব্দের কে কথা কহিল? আমার কর্ণবিবর যে ভরিয়া গেল? আজকে আমা হেন মন্দভাগিনীকে সহসা আহ্লাদিত করিল?" (দ্রষ্টব্যঃ 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধ) পঞ্চপতিকা দ্রৌপদীর চরিত্রাঙ্কন মহাভারতকারের অক্ষয়কীর্তি। দ্রৌপদী নিজের স্বয়ম্বর সভায় আপন চরিত্রের যে তেজ প্রদর্শন করিয়াছেন স্বল্পকথায় তাহার বর্ণনা বঙ্কিমচন্দ্র দিয়াছেন ঃ "যেদিন জয়দ্রথ দ্রৌপদী কর্তৃক ভূতলশায়ী হইবে, সেদিন দুর্যোধনের সভাতলে দ্যূতজিতা অপমানিতা মহিষী স্বামি হইতেও স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনে উন্মুখিনী হইবেন, সেদিন দ্রৌপদীর যে চরিত্র প্রকাশ পাইবে, অদ্য সেই চরিত্রের পরিচয় দিলেন" (দ্রষ্টব্যঃ 'দ্রৌপদী' প্রথম প্রস্তাব)। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার প্রণয়চিত্র অনুপম। দুষ্মন্ত যেন মহাবৃক্ষের বৃহচ্ছায়া, তাহা শকুন্তলা-কলিকাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন ঃ "পৃথিবীপতি কুঞ্জবনে বসিয়া সাধ করিয়া প্রেমকরারূপ খেলা খেলিতে বসিয়াছেন, মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় শকুন্তলা-নলিনী-কোরককে শুণ্ডে তুলিয়া বনক্রীড়ার সাধ মিটাইতেছেন, নলিনী তাতে ফুটিবে কি?" (দ্রষ্টব্য ঃ শকুন্তলা ও মিরান্দা) মহাকবি কালিদাসের 'শকুন্তলা' ও মহাকবি শেক্‌সপীয়ারের 'ওথেলো' – "শেক্‌স্‌পীয়ারের এই নাটক সাগরবৎ, কালিদাসের নাটক নন্দনকাননতুল্য। কাননে সাগরে তুলনা হয় না।" (দ্রষ্টব্য ঃ 'শকুন্তলা ও দেসদিমোনা' প্রবন্ধ')।

স্থূলত স্ত্রী-জাতি দুর্বলা হলেও সূক্ষ্মত স্ত্রীজাতি সবলা। ভূমণ্ডলের অনেক বড় কাজের সম্পাদনে তাহাদের হাত আছে ঃ 'The hand that rocks the cradle, rules the world'।– জননীর যে হস্ত শিশুর দোলনা দোলায়, সেই হস্ত জগৎ শাসন করে। বঙ্কিমচন্দ্র এই নীতিকথার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া স্ত্রী জাতির বল-সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা করিয়াছেন ঃ "মাতা বাল্যকালের শিক্ষাদাত্রী, স্ত্রী বয়ঃপ্রাপ্তের মন্ত্রী। স্ত্রীলোকের সাহায্য ব্যতীত সংসারের কোন গুরুতর কার্য সম্পন্ন হয় না, গহনা গড়ার ও গরু কেনা হইতে ফরাসিস্‌ রাজবিপ্লব এবং লুথরের ধর্মবিপ্লব পর্যন্ত সকলেই স্ত্রী-সাহায্য সাপেক্ষ। ফরাসিস্‌ স্ত্রীগণ ফরাসিস্‌ রাজ্যবিপ্লবে মহারথী ছিলেন। জানবলীন হইতে ইংলন্ড প্রটেস্টান্টে - Gospel light first dawned from Bullen's eyes...।" (দ্রষ্টব্য ঃ 'প্রাচীনা ও নবীনা')

বিস্মৃতপ্রায় এক মধুর সঙ্গীত শুনিতে বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। তিনি অতীতের সেই গহন গহ্বরে নিজেকে নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার যৌবনে যখন পৃথিবী সুন্দর ছিল, তখন তিনি এই সঙ্গীত শুনিয়াছেন। সেই কেন ভাল লাগে, এ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেনঃ "চিত্তের যে-প্রফুল্লতার জন্য ভাল লাগিত, সেই প্রফুল্লতা নাই বলিয়া ভাল লাগে না। আমি মনের ভিতর মন লুকাইয়া সেই মত যৌবন সুখচিন্তা করিতেছিলাম, সেই সময়ে এই পূর্বস্মৃতিসূচক সঙ্গীত কর্ণে প্রবেশ করিল, তাই এত মধুর বোধ হইল।" (দ্রষ্টব্য ঃ 'কে গায় ওই ঃ কমলাকান্তের দপ্তর')

মানুষমাত্রেই পতঙ্গ, আর সংসার বহ্নিময়। এই সংসার-বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে মানুষ-পতঙ্গের জন্ম। সকল মানুষ একই বহ্নিতে পুড়িয়া মরে না। কেহ বা রূপবহ্নিতে, কেহ বা জ্ঞান-বহ্নিতে, কেহ বা ধনবহ্নিতে, কেহ মানবহ্নিতে, কেহ ধর্মবহ্নিতে, কেহ বা ইন্দ্রিয়বহ্নিতে, নিজের জীবন উৎসর্গ করে। এই উৎসর্গের বর্ণনা দিয়া কাব্যকার কাব্য রচনা করেন। সংসার যেমন বহ্নিময়, তেমনি সংসার কাচময়। কেহ বহ্নিতে পুড়িতে গিয়া কাচে লাগিয়া ফিরিয়া আসে। সংসার কাচময় বলিয়া এতদিনে তাহা ভস্মীভূত হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র বিভিন্ন প্রকার বহ্নির উদাহরণ দিয়াছেন এইভাবে ঃ "মহাভারতকার মানবহ্নি সৃজন করিয়া দুর্যোধন পতঙ্গকে পোড়াইলেন; জ্ঞানবহ্নিজাত দাহের গীত 'Paradise Lost'; ধর্মবহ্নির অদ্বিতীয় কবি সেন্ট পল; ভোগবহ্নির-পতঙ্গ 'আন্টনি ক্লিওপেট্রা'; রূপবহ্নির 'রোমিও জুলিয়েত'; ঈর্ষাবহ্নির 'ওথেলো'; গীতগোবিন্দ ও বিদ্যাসুন্দরে ইন্দ্রিয়বহ্নি জ্বলিতেছে; স্নেহবহ্নিতে সীতা পতঙ্গের দাহ জন্য রামায়ণের সৃষ্টি?" (দ্রষ্টব্য ঃ 'পতঙ্গ' ঃ কমলাকান্তের দপ্তর)

রামেন্দ্রসুন্দর রোমান্টিক ভাবাবেগ অপেক্ষা বৈজ্ঞানিক নিরাসক্ত মন লইয়া প্রবন্ধ রচনায় ব্রতী হইয়াছেন। তাঁহার বিষয়-নির্বাচনে আছে স্বতন্ত্রতা, ভাবের মধ্যে আছে নমনীয়তা, আর আছে রসের স্বচ্ছতা। তাঁহার রচনাসমগ্রের মধ্যেই প্রকাশিত হইয়াছে বৈজ্ঞানিক নিরাসক্ত মনের অভিব্যক্তি এবং বর্ণনার সাবলীল ভঙ্গী; ভাষার আড়ষ্টতা নাই, ভাবের অসঙ্গতি নাই; ভাব, ভাষা ও বিষয় তিনই একীভূত হইয়াছে, যেন সাগরের বুকে তটিনীর বিশালতা।

বিজ্ঞানীরা আলোকের ধর্ম বুঝাইতে 'ঈথর' নামক বিশ্বব্যাপী একটি পদার্থের অস্তিত্বের কল্পনা করিয়াছেন। রামেন্দ্রসুন্দর এই 'ঈথর'-শব্দের অনুবাদে 'আকাশ' ধরিয়াছেন। ঈথর সর্বব্যাপী, এমন কোন জায়গা নাই, যেখানে ইহা নাই। মহাশূন্যে তো আছে, উপরন্তু জল, বায়ু, সোনা, রূপা, মাটি ইত্যাদি জড়পদার্থের অভ্যন্তরে ইহার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ইহার বিশেষগুণ হইল যে, 'ইহার কোন অংশ কোন রকমে একটু নাড়িয়া দিতে পারিলে তাহার চারিদিকে ঢেউ উঠিয়া দিগন্তে বিকীর্ণ হয়'। ঈথরের ঢেউ বেগে প্রবল, আকারে খুব ছোট। এই আকাশ-তরঙ্গের বর্ণনা দিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ঃ "সাগরপৃষ্ঠে বাত্যাযোগে শতাধিক হাত দীর্ঘ এক এক বিশাল তরঙ্গ উঠে; পুকুরের জল নাড়িয়ে আধহাত একহাত দীর্ঘ এক একটি ঢেউ উঠিয়া থাকে; আবার অগভীর জলের উপর মৃদু বায়ু-হিল্লোলে হয়ত এক আধইঞ্চি লম্বা, কি আরও ছোট ঢেউ উঠে। কিন্তু আকাশের যে-ঢেউগুলি আমাদের আলোক-জ্ঞান জন্মায়, তাহারা এক-একটি এত ছোট

যে, জলের ঢেউ-এর সহিত তাহার তুলনাই হয় না।" (দ্রষ্টব্য ঃ 'আকাশ তরঙ্গ' ঃ প্রকৃতি)

তাড়িতশক্তি ও চৌম্বকশক্তি – এই দুইটি শক্তি লইয়াই আধুনিক বিজ্ঞানীর কারবার। আলোকের ন্যায় এই দুই শক্তি একই আকাশের ক্রিয়াবিশেষ মাত্র। এই দুইশক্তি পরস্পরের পরিপূরক। একই ঈথরে উভয়শক্তির জন্ম। আলোক ও তড়িতের সম্বন্ধ-সম্পর্কে রামেন্দ্রসুন্দর বলিলেন ঃ "ম্যাক্‌স্‌ওয়েল প্রথমে স্থির করেন যে, যে-ঈথরে ঢেউ উঠিলে আলোক হয়, সেই ঈথরেই কোনরূপ টান পড়িলে তড়িতভাবের আবির্ভাব হয়; সেই ঈথরেই কোনরূপ ঘূর্ণি বা আবর্ত উপস্থিত হইলে চুম্বক জন্মে; এবং ঈথর যখন স্প্রিং-এর মত, তখন সেই তাড়িতভাবলোপের সময় অর্থাৎ ডিসচার্জের সময় বড় বড় ঢেউ উঠিতেও পারে। জর্মন অধ্যাপক হার্টজ কৌশলক্রমে ঐসকল বড় ঢেউগুলির প্রকৃত অস্তিত্ব সর্বসাধারণের প্রত্যক্ষ করিয়া আলোক ও তড়িতের সম্বন্ধ নিঃসংশয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন।" (দ্রষ্টব্য ঃ 'আকাশতরঙ্গ' ঃ প্রকৃতি)

প্রলয়ের কথা শুনিলে আমরা অজানা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠি। কোনদিন কোন অশুভক্ষণে আমাদের এই ধরাধাম হইতে চিরতরে বিদায় লইতে হইবে বলিতে পারি না। প্রলয়ের আশঙ্কা আছে কিনা এই বিষয়ে বিজ্ঞানীদেরও ঘোর সংশয় রহিয়াছে। এককালে এক বাষ্পময় মহাসাগরের ন্যায় বিশ্বজগৎ ব্যাপিয়া ছিল, "সেই বাষ্পময় মহাসাগর কালক্রমে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ও ঘনীভূত হইয়া এই দৃশ্যমান জগৎ প্রস্তুত করিয়াছে।" যে-চন্দ্রমণ্ডল এককালে পৃথিবীর কুক্ষিগত ছিল, আজ তাহা পৃথিবীর দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন; যে-গৃহগণ এককালে সূর্যমণ্ডলের অঙ্গীভূত ছিল, সৌরজগতের পরিধির প্রসারণহেতু তাহারাও বিচ্ছিন্ন, সেইজন্য সৌরজগতে ভবিষ্যতে আরও কঠিন দুর্ঘটনা ঘটিতেও পারে। এই দুর্ঘটনার নাম প্রলয়। রামেন্দ্রসুন্দর এতৎ সম্পর্কে বলিলেন ঃ "কালক্রমে সূর্য নিষ্প্রভ হইবে; যে-সকল তারকা গগনে দীপ্তি পাইতেছে, এক এক করিয়া তাহার সকলেই নিবিবে; এবং হয়ত সূর্যে সূর্যে সংঘট্ট ঘটিয়া পরিশেষে এক বাষ্পময় মহাসাগর পুনরায় বিশ্ব ব্যাপিবে, অথবা একমাত্র শীতল মহাপিণ্ডরূপে আকাশে অবস্থান করিবে। পরিণাম কিরূপ, তাহা এখনও স্থির করা যায় না।" (দ্রষ্টব্য ঃ 'জ্ঞানের সীমানা' ঃ প্রকৃতি)

রামেন্দ্রসুন্দর তাঁহার 'জিজ্ঞাসা'-গ্রন্থের 'উত্তাপের অপচয়' শীর্ষক প্রবন্ধে উত্তাপের অপচয়-হেতু পৃথিবীর বুকে প্রলয়ের পদধ্বনি শুনা যাইতে পারে বলিয়া আশঙ্কা ও ভবিষ্যদ্বানী করিয়াছেন।

জীববিদ্যার লক্ষ্য উদ্ভিদের সঙ্গে উদ্ভিদের, প্রাণীর সঙ্গে উদ্ভিদের, প্রাণীর সঙ্গে প্রাণীর সম্বন্ধ নির্ণয় করা। এইজন্য উক্ত বিদ্যা 'অভিব্যক্তি পরম্পরায় প্রত্যেক জাতির উদ্ভবের ধারা নির্দেশ করিতেছে।' জীবকোষের স্বাতন্ত্র্যরক্ষা জীবকোষের জীবনের উদ্দেশ্য, আর এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সামঞ্জস্য প্রয়াস দেখা যায়। যখনই সামঞ্জস্যের নাশ হয়, তখনই জীবকোষের মৃত্যু। জীবের জীবনরক্ষার নিমিত্ত শরীর মধ্যে আছে দুইটি বিভাগ ঃ একটি অঙ্গ বিভাগ, অপরটি আবরণ বিভাগ। জীবনরক্ষার জন্য আত্মপুষ্টি; এই আত্মপুষ্টির পরিণতি সন্তানোৎপাদন। 'ব্যক্তিগত জীবনরক্ষার প্রয়াসফলেই জাতিভেদ ও শ্রেণীভেদ ও বর্ণভেদের উদ্ভব; জীবনরক্ষার

উপযোগিতায় ব্যক্তিগত উৎকর্ষ ও অনুপযোগিতায় অপকর্ষ; জীবনযুদ্ধে বিজয়চেষ্টার ফলে জাতিগত অভিব্যক্তি'। রামেন্দ্রসুন্দর জীবের-জীবনরক্ষার উপযোগিতা সম্বন্ধে বলিলেন ঃ "এই সকল কথা কাব্য নহে, কল্পনা নহে, বাক্যালঙ্কার নহে, বিশুদ্ধ জ্ঞান। স্ত্রী-পুরুষভেদ স্বভাবের নিয়ম নহে, স্ত্রী-পুরুষভেদ বংশরক্ষার একমাত্র উপায় নহে; ব্যক্তিমাত্রেই স্ত্রী বা ব্যক্তিমাত্রেই পুরুষ; অথবা ব্যক্তিমাত্রই স্ত্রী ও পুরুষ; কাহারও স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব উভয়েই অবিকশিত; কাহারও বা উভয়ভাবই সমান পরিমাণে বিকাশপ্রাপ্ত; কোন ব্যক্তিতে স্ত্রীভাব পুরুষত্বে লীন, কোন ব্যক্তিতে পুরুষত্ব স্ত্রীভাবে আচ্ছাদিত। (দ্রষ্টব্য ঃ 'জ্ঞানের সীমানা' ঃ প্রকৃতি) রামেন্দ্রসুন্দর বলিতে চাহিয়াছেন – বংশরক্ষার তাগিদেই জীবনের মধ্যে জাতিভেদ, শ্রেণীভেদ আর বর্ণভেদ। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই 'একমাত্র জীবের বিচ্ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাত্র'। জীবহিসাবে ইতরপ্রাণী ও উন্নতপ্রাণীর সম্বন্ধ একই।

বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন-এর 'ডিসেন্ট অব ম্যান' নামক গ্রন্থে 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' সম্বন্ধে ধর্মশাস্ত্রের মূলসূত্র বিবৃত হইয়াছে। ধর্মনীতি মানব-সমাজের অন্তর্গত বলিয়া জীববিদ্যার আশ্রিত; মনোবিজ্ঞান ইহার প্রধান অবলম্বন। সর্বদেশে মনীষিগণ ধর্মস্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছেন, তবে তাহা 'দৃঢ়ভিত্তি লাভ করে নাই'। পাপ আর পুণ্য – এই দুইটি শব্দ লইয়া অহরহ আন্দোলন চলিয়াছে; কতই না রক্তপাত ঘটিয়াছে, তবুও মীমাংসার পথ মিলে নাই। ডারউইন মীমাংসার পথ দেখাইয়াছেন। রামেন্দ্রসুন্দর এই সম্বন্ধে বলিলেন ঃ "ডারুইনের নিকট মীমাংসার পথ পাওয়া গিয়াছে, অন্ততঃ মীমাংসার পথে তিনি যতটা আলো ফেলিয়াছেন, তৎপূর্বে তাহা পাওয়া যায় নাই।" (দ্রষ্টব্য ঃ "জ্ঞানের সীমানা" ঃ প্রকৃতি)

জগতের উৎপত্তি-সম্বন্ধে নানা বিজ্ঞানীর নানা মত। একটি মত 'নীহারিকাবাদ'। নীহারিকাবাদের উদ্ভাবক বিজ্ঞানী লাপলাস। ইংরাজীতে ইহাকে বলে 'নবুলার থিওরি' (Nebular Theory)। লাপলাস-এর মতে, কুজ্ঝটিকার মত যে-বায়বীয় পদার্থ সমস্ত বিশ্বব্যাপিয়া ছিল, সেই বায়ুরাশি বিশাল আবর্তের ন্যায় একটি কেন্দ্রের চারিদিকে ঘুরিত। মাধ্যাকর্ষণের ফলে সেই আবর্ত ক্রমে ঘনীভূত হওয়াতে তাহার পরিসর ক্রমেই হ্রাস পাইতে লাগিল। পরিসর কমিতে আবর্তের বেগ বর্দ্ধিত হইল; আবর্তনশীল বায়ুময় পিণ্ডের মেরুপ্রদেশ ক্রমে চাপিয়া গেল এবং ইহার মধ্যপ্রদেশ ক্রমে স্ফীত হইয়া শেষ অবধি অঙ্গুরীয় আকারে ছাড়িয়া আসিল। সেই অঙ্গুরীয় কালক্রমে খণ্ড খণ্ড হইয়া ঘনীভূত ও পিণ্ডীভূত হইয়া গ্রহের সৃষ্টি করিয়া মধ্যবর্তী আবর্তনশীল সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। সূর্য ঘনীভূত ও স্বল্পায়তন হইল এবং তাহা হইতে এক একটি অঙ্গুরী বিচ্যুত হইয়া এক একটি গ্রহের সৃষ্টি করিল। সূর্য ও নক্ষত্র হইতে যেভাবে গ্রহের উৎপত্তি, সেইরূপেও উৎপত্তি গ্রহ হইতে উপগ্রহের। রামেন্দ্রসুন্দর 'নীহারিকাবাদ' সম্বন্ধে সরস মন্তব্য করিলেন ঃ 'এই সৃষ্টি ব্যাখ্যার ভিতরে যতটুকু কবিত্বরস আছে, কেহ কেহ বলেন, সে-পরিমাণে যুক্তিরস নাই। তথাপি এই সৃষ্টিব্যাখ্যার একটা অপূর্ব মোহকর আকর্ষণ আছে; যেখানে সম্পূর্ণ আঁধার ছিল, সেখানে ইহার সাহায্যে আলো পাওয়া যায়।" (দ্রষ্টব্যঃ 'প্রাকৃত সৃষ্টি' ঃ প্রকৃতি)

জগতের প্রত্যক্ষ বস্তু রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের সমবায়ে গঠিত। যাহা অপ্রত্যক্ষ, তাহা স্মৃতি বা অনুমান, কল্পনা বা যুক্তি, বিশ্বাস বা স্বপ্নের বিষয়। এই অপ্রত্যক্ষ বস্তু কোনকালে কাহারও না কাহারও অনুভতি হইতে উৎপত্তি হইয়াছে। সমস্ত ব্যক্ত প্রকৃতির চিত্রের খানিকটা উজ্জ্বল আলোকে দীপ্ত, যাহা আমাদের প্রত্যক্ষ অংশ। রামেন্দ্রসুন্দর অব্যক্ত প্রকৃতির মূর্ত্তি কাব্যরসের সিঞ্চনে আঁকিয়াছেন এইভাবে ঃ "সেই উজ্জ্বল দীপ্ত প্রদেশের চারিপাশে ক্ষীণতর আলোকে, আধ আলোকে, আধ আঁধারে, আরও খানিকটা প্রদেশ ঈষৎ অপরিস্ফুটভাবে দেখা যাইতেছে। সেই প্রদেশটা বর্তমানে প্রত্যক্ষ নহে; তাহার খানিকটার নাম অতীত, খানিকটার নাম ভবিষ্যৎ; খানিকটা দূরগত ও দর্শনাতীত; আর খানিকটা সূক্ষ্ম বা অতীন্দ্রিয়; খানিকটার নাম স্মৃতিশ্রুতি; খানিকটার নাম অনুমান, কল্পনা ও স্বপ্ন ও আর খানিকটার নাম আশা ও ভয়।" (দ্রষ্টব্য – "প্রকৃতির মূর্তি" ঃ প্রকৃতি)

খুব সংক্ষেপে বঙ্কিমচন্দ্র ও রামেন্দ্রসুন্দরের রচনার বৈসাদৃশ্য দেখানো হইল।